
কাগজের বউ | শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাগজের বউ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

Landmarks

Suggested eBook Reader

Android

Lithum / Moon Reader

Desktop

Calibre

Apple

iBooks

Acknowledgment

করোনা প্রকোপের লকডাউনে বসে পাইথন শেখার প্রক্রিয়ায় বানানো বইগুলি।

Without many open source codes, projects available at Github and StackOverflow this would not have been possible. Cheers to those contributors. And of course to eBanglaLibrary..

For any ideas/suggestions on books, you would like to get implemented go to @bongboi or @boibongo_req

আরও ইপাব বা মোবি বই পেতে জয়েন করুন টেলিগ্রাম-এ @bongboi / @kindlebengali তে।

◈ Contributor ◈

This ebook is auto generated using python. Some parts/fonts may be broken. If you find such please improve and submit or report to telegram.

◈ Disclaimer ◈

⚠️

কাগজের বউ

০১.

ছোঁচা শব্দটা কোত্থেকে এল মশাই? ছুঁচো থেকে নাকি? হাতটান শব্দটারই বা ইতিহাস কী? কিংবা দু’ কান-কাটা কথাটাই বা অমন অপমানজক কেন?

অবশ্য অপমান কথাটারও কোনও মানে হয় না। অপমান মনে করলেই অপমান। আমার যা অবস্থা তাতে অপমান গায়ে মাখতে যাওয়াটাও এক লাটসাহেবি শৌখিনতা।

সুবিনয়দের পিছনের বারান্দায় আমি শুই। বারান্দাটা খারাপ নয়। বুক-সমান দেয়ালের গাঁথুনি, তার ওপরটা গ্রিল দেওয়া। বারান্দার অর্ধেকটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে খাওয়ার ঘর হয়েছে, বাকি অর্ধেকটায় এঁটো বাসনপত্র ডাই করা থাকে, মুখ ধোওয়ার বেসিন রয়েছে, কয়েকটা প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে খালি। এইসব বাক্সে বিদেশ থেকে কেমিকালস আসে। বিদেশের জিনিস বলে বাক্সগুলো বেশ মজবুত। দিনের বেলা প্যাকিং বাক্সগুলো, মোট তিনটে, একটার ওপর আর-একটা দাড় করানো থাকে। রাত্রিবেলা ওগুলো নামিয়ে আমি পাশাপাশি সাজিয়ে নিই। বাক্সগুলো সমান নয়, যার ফলে একটু উঁচু-নিচু হয়। তা হোক, তা হোক। আমার কিছু অসুবিধা হয় না। একেবারে মেঝেয় শোওয়ার চেয়ে এটুকু উচ্চতা মন্দ কী?

বারান্দার লাগোয়া পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে সুবিনয়ের বিধবা মা শোন খাটে, মেঝেয় শোয় ষোলোসতেরো বছর বয়সের ঝি কুসুম। অন্য ঘরে সুবিনয় এক খাটে শোয়, অন্য খাটে দুই বাচ্চা নিয়ে সুবিনয়ের বউ ক্ষণা। সামনের দিকে আরও দুটো ঘর আছে। তার একটা সুবিনয়ের ল্যাবরেটরি, অন্যটা বসবার ঘর। কিন্তু সেইসব ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়ার কথা ওদের মনে হয়নি। সুবিনয়ের এক বোন ছিল এই সেদিন পর্যন্ত বিয়ে হচ্ছিল না কিছুতেই। যতই তার বিয়ের দেরি হচ্ছিল ততই সে দিনরাত মুখ আর হাত-পায়ের পরিচর্যা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়ছিল। ছেলে-ছোকরা দেখলে কেমন হন্যের মতো হয়ে যেত, এবং শেষমেষ আমার মতো অপদার্থের দিকেও তার কিছুটা ঝুঁকে পড়ার লক্ষণ দেখে আমি বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ি। একদিন তো সে পরিষ্কার তার বউদিকে বলে দিল, এই শীতে উপলদা একদম খোলা বারান্দায় শোয়, তার চেয়ে খাওয়ার ঘরটায় শুতে দাও না কেন? এ কথা যখন হচ্ছিল তখন আমি চার-পাঁচ হাত দূরে

বসে সুবিনয়ের মুখোমুখি খাওয়ার টেবিলে চা খাচ্ছি। চোর-চোখে তাকিয়ে দেখি, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ানো সুবিনয়ের বোন অচলার দিকে চেয়ে রান্নাঘরের ভিতরে টুলে-বসা ক্ষণা একটু চোখের ইঙ্গিত করে চাপা স্বরে বলল, উঃ হু!

আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ঠিকই তো! খাওয়ার ঘরে দেয়ালের র‍্যাকে দামি স্টিলের বাসনপত্র, চামচ থেকে শুরু করে কত কী থাকে সরানোর মতো। এখানে আমাকে শোওয়ানো বোকামি। তা সে যাক গে। অচলার যখন ওইরকম হন্যে দশা, তখন আমার এ বাড়িতে বাস সে এক রাতে প্রায় উঠিয়ে দিয়েছিল আর কী। কোথাও কিছু না, মাঝরাতে একদিন দুম করে চলে এসেছিল বারান্দায়। বাথরুমে যাওয়ার প্যাসেজের ধারেই আমি শুই, মাঝরাতে বারান্দা দিয়ে বাথরুমে আনাগোনা করতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু অচলা বাথরুমে যায়নি, সটান এসে আমার প্যাকিং বাক্সের বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল। সেটা নিতান্ত মানবিক করুণাবশতও হতে পারে। কিন্তু তাইতেই আমার পাতলা ঘুম ভেঙে যেতে আমি 'বাবা গো' বলে চেচিয়ে উঠেছিলাম ভূত ভেবে। অচলা সময় মতো পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে বিকট শব্দ করেছিল। গোলমাল শুনে তার মা উঠে এসে বারান্দায় তদন্ত করেন, আমি তাকে বলি যে আমি দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। তিনি তা বিশ্বাস করেননি এবং আমার উদ্দেশেই বোধহয় বলেন, এ সব একদম ভাল কথা নয়। কালই সুবিনয়কে বলছি।

সুবিনয়কে তিনি কী বলেছিলেন কে জানে, কিন্তু সুবিনয় ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। ঘামালে বিপদ ছিল। কারণ, সুবিনয়ের চেহারা দানবের মতো বিশাল এবং রাগলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কোনও ব্যাপার নিয়েই সে বড় একটা মাথা ঘামায় না। সর্বদাই সে এক ভাবনার ঘোরে বাস করে। জাগতিক ব্যাপারস্যাপার নিয়ে তাকে কেউ কোনও কথা বললে সে ভারী বিরক্ত হয়। এই যে আমি তার বাড়িতে আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, এটাও যে খুব বাঞ্ছিত ব্যাপার নয় কোনও গৃহস্থের কাছে তাও সে বোঝে না। সে সর্বদাই তার কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে আছে। মস্ত এক কোম্পানির চিফ কেমিস্ট, কিছু পেপার লিখে বৈজ্ঞানিক জগতেও নাম-টাম করেছে। প্রায়ই বিদেশে যায়। সুবিনয় বাংলাদেশের সেই লুপ্তপ্রায় স্বামীদের একজন যাদের বউ খানিকটা সমীহ করে চলে। স্ত্রী স্বামীকে সমীহ করে, এ ব্যাপারটা আমি আর কোথাও দেখিনি এ জীবনে। সুবিনয়ের এই কর্তৃত্বময় অস্তিত্বের দরুনই আমি এ বাড়িতে বেশ কিছুকাল টিকে আছি। সুবিনয় যে আমাকে তাড়ায় না তার একটা গূঢ় কারণও আছে।

তা বলে যেন কেউ মনে না করেন যে, আমার প্রতি সুবিনয় স্নেহশীল। সত্য বটে, স্কুলজীবনে আমরা সহপাঠী ছিলাম মিত্র ইনস্টিটিউশনে। গলায় গলায় ভাব ছিল তখন। কলেজে ও সায়েন্স নিল, আমি কমার্স। কোনওক্রমে বি কম পাশ করে আমি লেখাপড়া ছাড়ি, সুবিনয় সোনার মেডেল পেয়ে এগিয়ে গেল। আমরা ভিন্ন হয়ে গেলাম। দুই বন্ধুর একজন খুব কৃতী হয়ে উঠলে আর বন্ধুত্ব থাকে না, কমপ্লেকস এসে যায়।

এখন আমাকে সবাই অপদার্থ বলে জানে। কেবল দীর্ঘকাল আমি নিজেই সেটা বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, আমার প্রতিভা একদিন বিকশিত হবেই। আমি মোটামুটি ভাল গান গাইতে পারতাম, চমৎকার থিয়েটার করতাম, নাটক-ফাটকও লিখেছি

এককালে উদ্বাস্তুদের দুঃখ নিয়ে, অল্পস্বল্প ছবি আঁকতে পারতাম, সবচেয়ে ভাল পারতাম কাদামাটি দিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরি করতে। এত বহুমুখী প্রতিভা নিজের ভিতরে দেখে আমার ধারণা ছিল, একটা না একটা লাইন ধরে আমি ঠিক উন্নতি করব, আর সবক'টা লাইনেই যদি উন্নতি করি তা হলে তো কথাই নেই। আরও অনেকেরই এককালে ধারণা ছিল। আমার বিচক্ষণ বাবা কিন্তু বরাবর বলে এসেছেন, এ ছেলের কিছু হবে না। এত দিকে মাথা দিলে কি কারও কিছু হয়?

আমার পারিবারিক ইতিহাসটি খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি মা বাবার একমাত্র সন্তান। আমার পাঁচ বছর বয়সে মা মারা গেলে বাবা আমার এক মাসিকে বিয়ে করেন। মায়ের পিসতুতো বোন। মাসির এক চোখ কানা আর দাত উঁচু বলে তাঁর বিয়ে হচ্ছিল না। আমি সেই মাসির কাছে মানুষ। বি কম পরীক্ষার কিছু আগে বাবা অপ্রকট হলেন। দুনিয়ায় তখন আমার মাসি, আর মাসির আমি ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু কেউ কারও ভরসা নই। মাসি বলত, তুই যদি চুরি ছ্যাঁচড়ামি গুন্ডামি বা ডাকাতি করেও দুটো পয়সা আনতে পারতিস!

বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে-সব উন্নতি হয় বলে শুনেছি তার কিছুই আমার হল না। হ্যাঁ, গান আমি এখনও আগের মতোই গাই, সুযোগ পেলে অভিনয়ও খারাপ করব না, আগের মতো নাটকও লিখতে পারি। ছবি কিংবা মাটির পুতুলও আঁকতে বা বানাতে পারি। কিন্তু সে সবও যেন কোথায় আটকে আছে, উন্নতি হয়নি। সিনেমায় নামতে গিয়েছিলাম। দু-চারটে সিনেমায় চান্স পেলাম বটে ছোট ছোট ভূমিকায় কিন্তু তাকে সিনেমায় নামা বলে না ঠিক। দুটো-একটা চাকরিও পেয়েছিলাম, একটার কোম্পানি ক্লোজার হল, অন্যটায় অস্থায়ি চাকরি টিকল না। মাসির লেখাপড়া ছিল না তেমন। বাবা লোকান্তরিত হওয়ার পর মাসি বিস্তর সেলাই-ফোড়াই করে সংসার চালাতে গিয়ে একটা ভাল চোখকেও প্রায় খারাপ করে ফেলল। মাসি যখন কাঁদত তখন কিন্তু তার অন্ধ চোখেও জল পড়ত।

বিনা কাজে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। বেশ লাগত। কাজকর্ম না করতে করতে এক ধরনের কাজের আলসেমি পেয়ে বসেছিল। আড্ডার অভাব ছিল না। সংসারের ভাবনা একা মাসিকে ভাবতে দিয়ে আমি চৌপর দিন বাইরে কাটাতাম। নিছক সঙ্গী না জুটলে ময়দানের ম্যাজিক, খোলামাঠের ফুটবল বা ক্রিকেট, ইউসিস লাইব্রেরিতে ঢুকে ছবির ম্যাগাজিন দেখে সময় কাটাতাম। বাবা বাড়ি করে যাননি, ভাড়া বাকি পড়ায় একবার বাড়িওলা হুড়ো দিয়ে তুলে দিল। বুড়ো বাড়িওলা মারা গেছে, ছেলেরা লায়েক হয়েছে। তাদের অত মায়া-দয়া নেই। মহা আতান্তরে পড়ে মাসি তার লতায়-পাতায় সম্পর্কের এক বড়লোক ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে উঠল। ভাই মাসিকে তাড়াল না, গরিব আত্মীয়দের আশ্রয় দিলে বিস্তর কাজ আদায় করা যায়। কিন্তু সেখানে আমার ঠাঁই হল না। তারা পরিষ্কারই বলে দিলেন, তোমার বোনপোকে রাখতে পারব না বাপু, বড়সড় ছেলে, নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে। এ কথা শুনে মাসি বলে, ওমা, বোনপো কী? ও আমার ছেলে, নিজের হাতে মানুষ করেছি যে! কিন্তু তারা কিছুতেই মত দিল না যখন মাসির তখন হাউহাউ করে কান্না। আমি মাসিকে অনেক স্তোকবাক্য দিয়ে তখনকার মতো ঠান্ডা করে কেটে পড়লাম। আমার যা হোক, কানা মাসিটা আমার তো না খেয়ে মরবে না। তবে সে বাড়িতে আমার যাতায়াত আছে, কয়েক বার নেমন্তন্নও

খেয়েছি।

তখন হাওড়া-কদমতলা রুটের একটা প্রাইভেট বাসে কন্ডাক্টরি করি। সারাদিন পয়সার ঝনঝন, লোকের ঘেমো গা, গাড়ির চলা, তার মধ্যে কখনও ঘুণাক্ষরেও মনে পড়ত না যে, আমি বি কম পাশ বা এ কাজের চেয়ে একটা কেরানিগিরি পেলে অনেক ভাল হত। সে যা হোক, কন্ডাক্টরি কিছু খারাপ লাগত না। তবে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়ার সময়ে আমি বেশি সুবিধা করতে পারতাম না। আর একটা লাভও হত বেশ, প্যাসেঞ্জারদের মুখে নানা খবর শুনে শুনে দুনিয়া সম্পর্কে বিনা মাগনা অনেক জ্ঞানলাভও হয়ে যেত। কয়েক দিনের মধ্যেই এলাকার হেক্কোড়দের চিনে ফেললাম, তাদের কাছে টিকিট বেচার প্রশ্ন উঠত না, উলটে খাতির দিতে হত। মনাই ঘোষ ছিলেন এলাকার মাথা। মনে আছে একবার তিনি পঞ্চাননতলার মোড়ে বাস থামিয়ে নেমে গিয়ে লন্ড্রির জামা কাপড় আনলেন, বাস ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। চোর, ছিনতাইবাজ, পকেটমার বিস্তর চেনা-জানা হয়ে। গেল, আজও ও-সব জায়গায় গেলে দু'-চার কাপ চা বিনা পয়সায় লোকে ডেকে খাওয়ায়। আনাড়ি ছিলাম বলে প্রথম দিকে আমার ব্যাগ থেকে বার দুই খুচরো হাপিশ হয়েছে। পরের দিকে কাকের মতো চালাক হয়ে উঠি। বাস চালাত ধন সিং নামে একটা রাজপুত। জলের ট্যাঙ্কের কাছে একবার সে একটা ছোকরাকে চাপা দিলে রাস্তার লোক রে রে করে তাড়া করল। ভয়ে ধন সিংয়ের আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। পঞ্চাননতলার সরু রাস্তায় যে আপ-ডাউন বাস কী করে চলে সেইটাই লোকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না, আর সেই মারাত্মক ভিড়ের সরু রাস্তায় ধন সিং বাসের গতি বোধকরি ত্রিশ-চল্লিশ মাইল তুলে দিল। কোনও স্টপে গাড়ি দাঁড়াচ্ছে না। প্যাসেঞ্জাররা প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও। এই স্টুপিড! এই উল্লুকের বাচ্চা! এই শুয়োরের বাচ্চা! কে শোনে কার কথা! আমরা দুই কন্ডাক্টর, আমি আর গোবিন্দ, দুই দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বিপদ দেখলেই লাফাব। ধন সিং কদমতলা পর্যন্ত উড়িয়ে নিল বাস। তারপর যেই থামল, অমনি কোত্থেকে যে শয়ে শয়ে লোক জুটে গেল চারধারে কে জানে! পালানোর পথ ছিল না। ধন সিং প্রচণ্ড মার খেয়ে আধমরা হয়ে হাসপাতালে গেল, আমি আর গোবিন্দ ঠ্যাঙানি খেয়ে কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে পড়ে রইলাম রাস্তায়। মুখ-টুখ ফুলে, গায়ে গতরে একশো ফোড়ার ব্যথা হয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা।

অনেক পরে চেনা একটা হোটেলের বাচ্চা বয়গুলো এসে আমাদের জলটল দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। দু'জনে কষ্টেসৃষ্টে চেনা দোকানে গিয়ে কোকাতে কোকাতে বসলাম। ব্যাগ দু'জনেরই হাপিশ হয়ে গেছে, জামা-টামা ছিড়ে একাকার, গোবিন্দর চটিজোড়াও হাওয়া। পাবলিক প্যাদালে তো কিছু করার নেই। রাগও করা যায় না, কার মুখ মনে করে রাগ করব? গোটা জীবন আর তাবৎ দুনিয়ার ওপর রাগে চোখে জল আসে শুধু। গোবিন্দ আর আমি একটা করে কোয়ার্টার রুটি আর ছোট সানকির মতো কলাই করা প্লেটে হাফ প্লেট করে মাংস নিয়ে বসলাম। মাংস মুখে দিয়েই গোবিন্দ উহু উহু করে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, জিভটা কেটে এই ফুলেছে মাইরি, নুন ঝাল পড়তেই যা চিড়িক দিয়েছে না! খাই কী করে বল তো!

এ সব কথা যখন হচ্ছে তখনই ছোকরা বয়টা এসে বলল, গোবিন্দদা, আপনার দেশ থেকে আপনার খোঁজে একটা লোক অনেক বার এসে ঘুরে গেছে। ওই আবার এসেছে,

দেখুন।

গোবিন্দ মুখ তুলল, আমিও দেখলাম, বুড়ো মতো একটা লোক খুব বিষন্ন মুখের ভাব করে এসে বেঞ্চে বসে মুখের ঘাম মুছল সাদা একটা ন্যাকড়া পকেট থেকে বের করে।

গোবিন্দ বলল, তারক জ্যাঠা, খবরটবর কী? খারাপ নাকি?

হ্যাঁ বাবা। তোমার পিতৃদেব—

গোবিন্দ আঁতকে উঠে বলল, আর বলবেন না, আর বলবেন না।

লোকটা ভড়কে থেমে গেল। আর দেখলাম, গোবিন্দ গোগ্রাসে মাংস-রুটি খাচ্ছে জিভের মায়া ত্যাগ করে। খেতে খেতেই বলল, ও শুনলেই খাওয়া নষ্ট। এখন পেটে দশটা বাঘের খিদে। একটু বসুন, ও খবর পাঁচ মিনিট পরে শুনলেও চলবে। শত হোক, হিন্দুর ছেলে তো! ও খবর শুনলে খাই কী করে!

খাওয়ার শেষে গোবিন্দ উঠে দাম-টাম দিয়ে এল, বলল, চলুন, দেশে যেতে হবে তো?

তারক জ্যাঠা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা তো হবেই। পরশুদিনের ঘটনা বাবা, মাঠ থেকে ফিরে তোমার বাবামশাই হঠাৎ উঠোনে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কত জল, পাখা, ওঝা, বদ্যি, হাঃ—

গোবিন্দ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, উপল, খবরটা ভাল। তারপর গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, হক্কের মরা মরেছে, জ্যাঠা। আর বেঁচে থেকে হতটা কী? দুনিয়া তো ছিবড়ে হয়ে গিয়েছিল। এই বলে সে আমার দিকে চেয়ে বলল, উপল, তুইও চল। গায়ের ব্যথাটা ঝেড়ে আসবি। দেশে আমাদের ধানজমি আছে। বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল বদমাইশির জন্য, তাই ফিরতে পারছিলাম না। নইলে কোন শালা মরতে কন্ডাক্টরি করে।

বিনা নোটিশে চাকরি ছেড়ে দু'জনে সেই রাতে কেটে পড়লাম হাওড়া জেলার শিবগঞ্জে।

আমার স্বভাব বসতে পেলেই ঠেলেঠুলে শুয়ে পড়া। গোবিন্দর দেশটা বেশ ভালই। বাগনান থেকে বাসে ঘণ্টা কয়েকের রাস্তা। পৌঁছে গেলে মনে হয়, ঠিক এ রকমধারা জায়গাই তো এতকাল খুঁজছিলাম। গোবিন্দদের ধানজমি বেশি না হোক, ওদের দু'বেলা ভাতের অভাব নেই। বিরাট একটা নারকোল বাগান আছে। মেটে দোতলা বাড়িতে বেশ মাঝারি বড় সংসার।

দু'বেলা খাওয়ার-শোওয়ার ভাবনা নেই, আমি তাই নিশ্চিন্তে সেখানে শেকড় চালিয়ে দিলাম। ভরসা হল, বাকি জীবনটা এখানেই কেটে যাবে বুঝি! গোবিন্দ তখন প্রায়ই বলত, দাঁড়া তোকে এ দিকেই সেট করিয়ে দেব। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই গোবিন্দ বিয়ে করে বসল, আর তার দুমাস বাদেই গোবিন্দর মুখ হাঁড়ি। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। বুঝলাম, ওর বউ বুদ্ধি দিয়েছে। তবু গায়ে না-মেখে আমি আরও এক মাস

কাটিয়ে দিলাম। মোট ছ' মাস পর। গোবিন্দর বড় ভাই একদিন খাড়ুবেড়েতে যাত্রা দেখে ফেরার পথে গহিন রাতে রাস্তায় টর্চ ফেলে ফেলে আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে নরমে গরমে বলেই ফেলল, এ বয়সটা তো বসে খাওয়ার বয়স নয় গো বাপু। গাঁ-ঘরে কাজকর্মই বা কোথায় পাবে। বরং কলকাতার বাজারটাই ঘুরে দেখোগে।

গোবিন্দর বড় ভাই নন্দদুলালের খুব ইচ্ছে ছিল তার মেয়ে কমলিনীকে আমি বিয়ে করি। কিন্তু কমলিনীর বয়স মোটে বারো, সুশ্রীও নয়, তা ছাড়া আমারও বিয়ের ব্যাপারটা বড় ঝামেলা বলে মনে হয়, তাই রাজি হইনি, ঘরজামাই রাখলেও না হয় ভেবে দেখতাম। তা সে প্রস্তাবও নয়, বরং কমলিনীর মা আমাকে প্রায়ই কাজ খোঁজার জন্য হুড়ো দিত, চাষবাস দেখতে পাঠাত। বেলপুকুর বাজারে গিয়ে শুকনো নারকোল বেচে এসেছি কতবার। আখের চাষ হবে বলে গোটা একটা খেত নাড়া জ্বেলে আগুনে পোড়াতে হয়েছিল। এত সব কাজকর্ম আমার ভাল লাগে না। বউ হলে সে আরও তাড়া দেবে সারা জন্ম।

এক বর্ষার রাতে গোবিন্দদের গোলাঘরে চোরে সিঁধ দিল। বিস্তর ধান লোপাট। সকালবেলা খুব চেঁচামেচি হল, তারপর থিতু হয়ে সবাই বসে এক মাথা হয়ে ঠিক করল যে, এবার থেকে আমাকে সারা রাত বাড়ি চৌকি দিতে হবে। একটা নিষ্কর্মা লোক সারা দিন বসে খাবে, কোনও কাজে লাগবে না, এ কি হয়?

দিন পনেরো পাহারা দিতেও হল। এক রাতে ফের চোর এল। আমার চোখের সামনে পরিষ্কার পাঁচ-ছ'জন কালো কালোলোক। তাদের দু'-একজন আমার মুখ চেনা। দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বসে লণ্ঠন পাশে নিয়ে একটা লম্বা লাঠি উঠোনে মাঝে মাঝে ঠুকছিলাম, দুটো দিশি কুকুর সামনে ঝিমোচ্ছে। এ সময়ে এই কাণ্ড। চোর দেখে ভিরমি খাই আর কী। লাঠি যে মানুষের কোন কাজে লাগে তা তখনও মাথায় সেঁধোচ্ছে না। চোর ক'জন এসে সোজা আমার চারধারে দাঁড়িয়ে গেল, একজন বলল, উপল শালা, মেরে মাঠে পুঁতে দিয়ে আসব, মনে থাকে যেন। কুকুর দুটো দু'বার ভুক ভুক করে হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে লাগল চোরদের খাতির দেখানোর জন্য। দিশি কুকুরদের বীরত্ব জানা আছে। আমিও তাদের দেখে কায়দাটা শিখে গেলাম, এক গাল হেসে বললাম, আরে তোমরা ভাবো কী বলো তো, অ্যাঁ? পাহারা কি আসলে দিই? গুঁতোর চোটে পাহারা দেওয়ায়। যা করার চটপট সেরে নাও ভাই সকল, আমি চার দিকে চোখ রাখছি।

চোরেরা যখন মহা ব্যস্ত ঠিক তখনই আখের বুঝে আমি লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে লম্বা দিলাম। নইলে পরদিন আমার ওপর দিয়ে বিস্তর ঝামেলা যেত।

তা সেই লাঠি আর লণ্ঠন ছাড়া তখন আর আমার কোনও মূলধন ছিল না। আফসোস হল, চোরদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে যদি কিছু নগদ বা ঘটিবাটি গোবিন্দদের বাড়ি থেকে হাতিয়ে আনতে পারতাম তো বেশ হত।

আমার বাবা সারা জীবনটাই ছিলেন ডাকঘরের পিয়োন, শেষ জীবনে সর্টার, আর এক থাক উচুতে উঠতে পারলে তাকে ভদ্রলোক বলা চলত, তা তিনি উঠতে পারেননি। বিস্তর ধারকর্জ করে খাওয়া-দাওয়া ভাল করতেন। ওই এক শখ ছিল। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর

অর্ধেকই প্রায় ফৌত হয়ে গিয়েছিল ওই কর্মে। সারাটা জীবন তাকে কেবল টাকা খুঁজতে দেখেছি। অন্য সব টাকার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বাড়ির আনাচে কানাচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশের মতো সার্চ চালাতেন। বিছানার তোশক উলটে, জাজিম উঁচু করে চাটাইয়ের তলা পর্যন্ত, ওদিকে কাঠের আলমারির মাথা থেকে শুরু করে রান্নাঘরের কৌটো বাউটো, পুরনো চিঠিপত্রের বান্ডিলের মধ্যে পরম উৎসাহে তিনি টাকা বা পয়সা খুঁজতেন। কদাচিং এক আধটা দশ বা পাঁচ পয়সা পেয়ে আনন্দে ‘অ্যাই যে, অ্যাই যে, বলেছিলুম না!’ বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। ঘরের গোছগাছ হাঁটকানোর জন্য মাসি খুব রাগ করতেন বাবার ওপর। বাবা সে-সব গায়ে মাখতেন না, বরং সুর করে মাসিকে খ্যাপাতেন, কানামাছি ভোঁ ভোঁ..। কানা মাসির নামই হয়ে গিয়েছিল কানামাছি।

বাবার কাছ থেকে ওই একটা স্বভাব আমি পেয়েছি। আমারও স্বভাব যখন তখন যেখানে সেখানে অবসর পেলেই পয়সা খোঁজা, হাটে-বাজারে, রাস্তায়-ঘাটে ঘর-দোরে প্রায় সময়েই আমি হাট পাট করে পয়সা খুঁজি। সিকিটা আধুলিটা পেয়েও গেছি কখনও সখনও। না পেলেও ক্ষতি নেই, খোঁজাটার মধ্যেই একটা আনন্দ আছে, যেমন লোকে খামোকা ঘুড়ি উড়িয়ে বা মাছ ধরতে বসে আনন্দ পায় এ অনেকটা সে রকমই আনন্দ।

একবার হরতালের আগের দিন বিকেলে বাবা পবদিনের বাজার করতে গেছেন। তখনও বুড়ো বাড়িওলা বেঁচে। বাজারে বাবার সঙ্গে দেখা হতেই বুড়ো বাড়িওলা আঁতকে উঠে বললেন, এ কী বাপ, তোমাকে না আজ সকালেই বাজার করে ফিরতে দেখলুম! আবার এ বেলা বাজারে কেন বাবা? বাবা মাথা চুলকে বললেন, কাল হরতাল কিনা, তাই কালকের বাজারটা সেরে রাখছি। শুনে বুড়ো রেগেমেগে খেকিয়ে উঠলেন, হরতাল ছিল তো হরতালই হত, শাকভাত নুনভাত কি মুড়ি-টুড়ি চিবিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতে না। অ্যা? এ কী ধরনের অমিতব্যয় তোমাদের, দিনে দু-দুবার বাজার। এ বয়সেই যদি দুটো পয়সা রাখতে না পারো তো কি গুচ্ছের ছেলেপুলে হয়ে গেলে তখন পারবে? দুটো পয়সার মর্ম যে কবে বুঝবে তোমরা! বয়স হয়ে গেলে কপাল চাপড়াবে।

সেই থেকে বাবা একটা ঠাট্টার কথা পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সময়েই খুক খুক করে হাসতে হাসতে বললেন, দুটো পয়সা রাখতে না পারলে...!

কিন্তু ঠাট্টার কথা হলেও, ওই দুটো পয়সা রাখতে না পারায় কানা মাসিকে ভাইয়ের বাড়িতে ঝিগিরি করতে হচ্ছে। আর আমার হাতে হারিকেন।

বাস্তবিকই হারিকেন আর লাঠি সম্বল করে গোবিন্দর বাড়ি থেকে যেদিন পালাই সেই দিন রাতে ভারী একটা দুঃখ হচ্ছিল আমার। বলতে কী গোবিন্দর বাড়িতে থাকতে আমি দুটো পয়সা করেছিলাম। প্রায় দিনই এটা-সেটা নিয়ে গোপনে বেচে দিতাম, ঘরের মেঝেয় একটা সোনার মাকড়ি কুড়িয়ে পেয়ে রেখে দিয়েছিলাম, দু-চারটে পয়সা কুড়িয়ে-টুড়িয়ে একটা বাঁশের চোঙায় জমিয়ে রেখেছিলাম। সেই গুপ্ত সম্পদ গোবিন্দদের পশ্চিমের বাতায় গোঁজা আছে। আনতে পারিনি।

.

০২.

কাল রাতে সুবিনয় আর ক্ষণা অনেকক্ষণ আমাকে নিয়ে কথা বলাবলি করছিল। ক্ষণা চায় না যে আমি আর এক দিনও এ বাড়িতে থাকি। কথায় কথায় সে তার বরকে বলল, বাজার-ফেরত পঁয়ত্রিশটা পয়সা তুমি খাওয়ার টেবিলে রাখলে আজ সকালে, নিজের চোখে দেখা আমার! পনেরো মিনিট বাদে গিয়ে দেখি পয়সা হাওয়া। তোমার ওই দু' কানকাটা ছোঁচা বন্ধুটির কিন্তু বেশ ভালরকম হাতটান আছে।

সুবিনয় ঘুমগলায় বলল, পয়সাকড়ি সরিয়ে রাখলেই হয় সাবধান মতো।

আহা, কী কথার ছিরি? সারাক্ষণ ঘরে একটা চোর ছোঁচা বসবাস করলে কাহাতক সাবধান হবে মানুষ? তার চেয়ে ওকে এবার সরে পড়তে বলো, অনেক দিন হয়ে গেছে। আজ তুমি বাজার করলে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই তো তোমার ওই প্রাণের বন্ধুই বাজার করে, বাজারে কত পয়সা হাতায় তার হিসেব কে করছে?

এই রকম সব কথা হচ্ছিল, আমি প্যাকিং বাক্সের বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজায় কান পেতে সব শুনছি। খুবই অপমানজনক কথা। কিন্তু কতটা অপমানজনক তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া, আমাকে শুনিয়েও তো বলেনি যে খামোকা অপমান বোধ করতে যাব।

নিশুত রাতে আমার বিছানায় শুয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে এক ভাঙা চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুম ছুটে গেল। কী করে বোঝাই এদের যে, আমারও দু-চারটে পয়সাকড়ির দরকার হয়। আমার সবচেয়ে অসুবিধা এই যে, আমার আজকাল বড় খিদের ভয়। সারা দিন আমার পেটে একটা খিদের ভাব চুপ করে বসে আছে। ভরা পেটেও সেই খিদের স্মৃতি। কেবল ভয় করে, আবার যখন খিদে পাবে তখন খেতে পাব তো!

আমার আর-একটা সমস্যা হল, পয়সা। পয়সা খুঁজতে খুঁজতে আমার জীবনটা গেল। সেই যে লণ্ঠন আর লাঠি হাতে গোবিন্দদের বাড়ি থেকে নিশুত রাতে বেরিয়ে পড়লাম, সেই থেকে পয়সা খোঁজার বিরাম নেই। পয়সাও যে কত কায়দায় আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে, জীবনভোর লুকোচুরি খেলছে আমার সঙ্গে তা বলে শেষ হয় না।

লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে সেই পালানোর পর দু'দিন বাদে বাগনানের বাসের আড্ডায় তিনটে ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। তাদের ব্যাবসাপত্র খারাপ নয়, চুরি, ছিনতাই আর ছোটখাটো ডাকাতি করে তাদের ভালই চলে। অনেক বলে কয়ে ভিড়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। তারা আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে, বিস্তর শাসিয়ে সাবধান করে দিল, বেগরবাঁই করলে জান যাবে।

বাগনান বাজারে এক দুপুরে বসে আছি, ছোট্ট একটা খুকি তার বাচ্চা ঝিয়ের সঙ্গে দোকানের সওদা করতে এসেছে। ছ্যাঁচোড়দের একজন কদম বলল, ওই খুকিটা হল

হোমিয়ো ডাক্তার কালীপদ ঘোষের ছোট মেয়ে, কানে একজোড়া সোনার বেলফুল দেখা যাচ্ছে। দেখবে নাকি হে উপল ভদ্র?

ওরা কেন যে আমার নামের সঙ্গে ভদ্র কথাটা জুড়ে নিয়েছে তা ওরাই জানে। প্রস্তাব শুনে আমার হাত-পা ঝিমঝিম করছিল। আসলে আমার সব কাজে বাগড়া দেওয়ার জন্য একজন সং আছে। সে আমার বিবেকবুড়ো। যখন-তখন এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করে রাজ্যের হিতকথা ফেঁদে বসে। তাকে না পারি তাড়াতে, না পারি এড়াতে।

ছ্যাঁচোড়দের অন্য একজন হাজু আমাকে জোর একটা চিমটি দিয়ে বলল, দু'দিন ধরে খাওয়াচ্ছি তোমাকে, সে কি এমনি? যাও কাজে লেগে পড়ো। ধরা পড়ে মার খাও তো সেও এ লাইনের একটা শিক্ষা। মারধর বিস্তর খেতে হবে। বাবুয়ানি কীসের?

সত্যিই তো। আমার যে মাঝে মাঝে এক পাগলাটে খিদে পায়। সেই সব খিদের কথা ভেবে বড় ভয় পাই। কাজে না নামলে কেউ খেতে দেবে কেন? উঠে পড়লাম।

জানা আছে, কালীপদ ঘোষের মেয়ে, কাজেই একটা সুবিধে। অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটিতে খানিকটা বনস্পতি কিনে মেয়েটা রাস্তায় পা দিতেই গিয়ে বললাম, ও খুকি, কালীপদদার কাণ্ডখানা কী বলো তো! পেট ব্যথার একটা ওষুধ কবে থেকে করে দিতে বলছি।

খুকি কিছু অবাক হয়ে বলল, বাবা তো খড়গপুরে গেছে।

খুশি হয়ে বলি, আমাকে চিনতে পারছ তো? আমি রামকাকা, লেভেল ক্রসিং-এর ধারে রঘুদের বাড়ি থাকি। চেনো?

খুকি মাথা নাড়ল দ্বিধাভরে। চেনে।

আমি বললাম, তোমার বাবা কয়েকটা জিনিস চেয়ে রেখেছিল আমার কাছে, দেব দিচ্ছি করে আর দেওয়া হয়নি। মহীনের দোকানে রেখে দিয়েছি, নিয়ে যাবে এসো।

বলে বাজারের ভিতর দিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যাই। ঝি মেয়েটা দুনিয়া কিছু বেশি চেনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, ও বিন্তি যাসনে, এ লোকটা ভাল না।

ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে এক ধমক মারলাম, মারব এক থাপ্পড় বদমাশ ছোটলোক কোথাকার! এই সেদিনও কালীপদদা বলছিল বটে, বাচ্চা একটা ঝি রেখেছে সেটা চোর। তোর কথাই বলছিল তবে।

ঝি মেয়েটা ভয় খেয়ে চুপ করে গেল। মাথাটা আমার বরাবরই পরিষ্কার। মতলব ভালই খেলে। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা বিশ্বাসে খুকিটা এল আমার সঙ্গে, ঝি মেয়েটাও। বাজারের দোকানঘরের পিছু দিকটায় একটা গলি মতন। মুদির দোকান থেকে একটা ঠোঙায় কিছু ত্রিফলা কিনে এনে খুকির হাতে দিয়ে বললাম, এইটে বাবাকে দিয়ে আমার কথা বোলো, তা হলেই হবে। সবই বলা আছে।

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল, ঠোঙা হাতে আমাকে অবাক হয়ে দেখছিল। পিছু ফিরতেই আমি ফের ডেকে বললাম, ও বিন্তি, তোমার বাপ-মায়ের কি আক্কেল নেই! ওইটুকু মেয়ের কানে সোনার দুল পরিয়ে বাড়ির বার করেছে! এসো, এসো, ওটা খুলে ঠোঙায় ভরে নাও। কে কোথায় গুন্ডা বদমাশ দেখবে, দু' থাপ্পড় দিয়ে কেড়ে নেবে। কালও ছিনতাই হয়েছে এখানে।

মেয়েটা কাঠ হয়ে আছে। ঝি মেয়েটা ঝেঁঝে উঠল, কেন খুলবে, অ্যাঁ? চালাকির আর জায়গা পাওনি?

তাকে ফের একটা ধমক মারলাম। কিন্তু বিন্তিও দুল খুলতে রাজি নয়। মাথা নেড়ে বলল, না, খুলব না। সদ্য কান বিঁধিয়েছি, দুল খুললে ছ্যাঁদা বুজে যাবে।

কথাটা আমারও যুক্তিযুক্ত মনে হল। এ অবস্থায় ওর কান থেকে দুল খুলি কী করে?

ছ্যাঁচোড়দের তিন নম্বর হল পৈলেন। সে কম কথা আর বেশি কাজের মানুষ। আমি যখন খুকিটিকে তার ঝি সমেত চলে যেতে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি, ওরাও চলে যাচ্ছে, ঠিক সে সময়ে। পৈলেন এসে গলির মুখটা আটকে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, রোগা কিন্তু পাকানো শক্ত চেহারা। কলাকৌশলের ধার দিয়েও গেল না। ঝি মেয়েটাকে একখানা পেল্লায় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, চেঁচালে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব।

সেই দৃশ্য দেখে বিন্তি থর থর করে কাঁপে, কথা সরে না। এক-একটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে পৈলেন পুট পুট করে দুটো বেলকুঁড়ি তার কান থেকে খুলে বলল, বাড়ি যাও, কাউকে কিছু বললে কিন্তু মেরে ফেলব।

রেল স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পৈলেন আমাকে বলল, সব জায়গায় কি আর কৌশল করতে আছে রে আহাম্মক? গায়ের জোর ফলালে যেখানে বেশি কাজ হয়, সেখানে অত পেঁচিয়ে কাজ করবি কেন?

হক কথা।

বেলকুঁড়ি দুটো বেচে যে পয়সা পাওয়া গেল তার হিস্যা ওরা আমাকে দিল না, আমার আহাম্মকিতেই তো ব্যাপারটা নষ্ট হচ্ছিল প্রায়।

এক দিন পাঁশকুড়া-হাওড়া ডাউন লোকালে তক্কে তক্কে চারমূর্তি উঠেছি। শনিবার সন্ধে, ভিড় বেশি নেই। এক কামরায় একজোড়া বুড়োবুড়ি উঠেছে। বুড়ির গায়ে গয়নার বন্যা। ইদানীং কারও হাতে মোটা বালা সমেত ছ'গাছা করে বারোগাছা চুড়ি, গলায় মটরদানা হার বা কানে ঝাপটা দেখিনি। আঙুলে অন্তত পাঁচ আনি সোনার দুটো আংটি। বুড়োর হাতে ঘড়ি, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, হাতে রুপো-বানো লাঠি। এ যেন চোর-ছ্যাচোড়দের কাছে নেমন্তন্নের চিঠি দিয়ে বেরোনো।

ফাঁকা ফাঁকা কামরায় বুড়ো উসখুস করছে। মুখোমুখি আমরা বসে ঘুমের ভান করে

চোখ মিটমিট করে সব দেখছি। বুড়ো চাপা গলায় বলল, এত সব গয়না-টয়না পরে বেরিয়ে ভাল কাজ করোনি। ভয়-ভয় করছে।

বুড়ি ধমক দিয়ে বলল, রাখো তো ভয়! গা থেকে গয়না খুলে রেখে আমি কোনও দিন বেরিয়েছি নাকি? ও সব আমার ধাতে সইবে না।

বুড়ি ঝাঁপি থেকে স্টিলের তৈরি ঝকঝকে পানের বাটা বের করে বসল। বাটাখানা চমৎকার। বারোটা খোপে বারো রকমের মশলা, মাঝখানে পরিষ্কার ন্যাতায় জড়ানো পানপাতা। দামি জিনিস।

পৈলেন আর হাজু গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, আমি আর কদম কামরার দু'ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। পৈলেনের পিস্তল আছে, হাজুর ছুরি। কদম নলবন্দুক হাতে ওধার সামলাচ্ছে। কী জানি কেন, আমার হাতে ওরা অস্ত্রশস্ত্র কিছু দেয়নি। কেবল ধারালো দুটো ব্লেড আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরতে শিখিয়ে দিয়েছে হাজু, বলেছে, যখন কাউকে ব্লেড ধরা হাতে আলতো করে গালে-মুখে বুলিয়ে দিবি, তখন দেখবি কাণ্ডখানা। রক্তের স্রোত বইবে।

পৈলেন পিস্তল ধরতেই বুড়ো বলে উঠল, ওই যে দেখো গো, বলেছিলুম না! ওই দেখো, হয়ে গেল।

বুড়ি পানটা মুখে দিয়ে পৈলেনের দিকে তাকিয়ে বলল, এ মিনসেটাই ডাকাত নাকি! ওমা, এ যে একটু আগেও সামনে বসে ঝিমোচ্ছিল গো!

বুড়ো আস্তে করে বলল, এখন ঝিমুনি কেটে গেছে। সামলাও ঠ্যালা।

বুড়ি ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে, আমি সামলাব কেন তুমি পুরুষ মানুষ সঙ্গে থাকতে? এককালে তো খুব ঠ্যাঙা-লাঠি নিয়ে আবগারির দারোগাগিরি করতে। এখন অমন মেনিমুখো হলে চলবে কেন?

পৈলেন ধৈর্য হারিয়ে বলল, অত কথার সময় নেই, চটপট করুন। আমাদের তাড়া আছে।

বুড়ি ঝংকার দিল, তাড়া আছে সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু গয়না আমি খুলছি না। তাড়া থাকলে চলে যাও।

হাজু 'চপ' বলে একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে হাতের আধ-হাত দোধার ছোরাটা বুড়োর গলায় ঠেকিয়ে বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি গয়না খুলতে। যদি দেরি হয় তো এই বুড়োমানুষটার হয়ে যাবে দিদিমা। বিধবা হবেন।

বুড়ি জর্দা আটকে দু'বার হেঁচকি তুলে হঠাৎ হাউড়ে মাউড়ে করে কেঁদে উঠে চেঁচাতে লাগল, ওমা গো, ওগো তোমরা সব দেখো, কী কাণ্ড। বুড়োটাকে মেরে ফেলল যে!

কামরায় মোট জনা কুড়ি লোকও হবে না। এধার-ওধার ছিটিয়ে বসে ছিল। কেউ নড়ল না। সবাই অন্যমনস্ক হয়ে কিংবা ভয়ে পাথর হয়ে রইল। কেবল দুটো ছোকরা টিটকিরি দিল কোথা থেকে, দাদাদের কমিশন কত? একজন বলল, ও দাদা, অথরিটি কত করে নেয়? সব বন্দোবস্ত করা আছে, না?

গলায় ছোরা-ঠেকানো অবস্থায় বুড়ো তখন তম্বি করছে, কী ব্যাপার বলো তো তোমার! গা করছ না যে? পাঁচ মিনিটের আর কত বাকি আছে শুনি! শিগগির গয়না খোলো।

বুড়ি তখনও জর্দার ধক সামলাতে পারেনি। তিন-তিনটে হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, খুলতে বললেই খুলব, না? এ সব গয়না ফের আমাকে কে তৈরি করে দেবে আগে বলো! তুমি দেবে?

দেব, দেব শিগগির খোলো। বুড়ো তাড়া দেয়।

কিন্তু বুড়ি তবু গা করে না। কষ্টেসৃষ্টে একগাছা চুড়ি ডান হাত থেকে আঙুলের গাঁট পর্যন্ত এনে বলে, সেই কবে পরেছিলুম, এখন তো মোটা হয়ে গেছি, এ কি আর খোলা সহজ?

হাজু তার ছোরাটা এগিয়ে দিয়ে পিস্তলটা পৈলেনের হাত থেকে নেয়। পৈলেন ছোরাটা চুড়ির ফাঁকে ঢুকিয়ে এক টানে কেটে নেয়। দিদিমা চেঁচাতে থাকেন ভয়ে, কিন্তু পৈলেনের হাত পাকা, কোথাও একটুও ছড়ে যায়নি। পৈলেন পটাপট চুড়িগুলো কাটতে থাকে।

দিদিমা দাদুর দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, কথা দিলে কিন্তু! সব গয়না ঠিক এ রকম তৈরি করে দিতে হবে। তখন নাকিসুরে বলতে পারবে না, এখন রিটায়ার করেছি, কোত্থেকে দেব!

দেব, দেব।

দিদিমা তখন চার দিকে তাকিয়ে লোকজনের মুখ চেয়ে বলে, শুনে রেখো তোমরা সব, সাক্ষী রইলে কিন্তু। উনি বলেছেন সব ফের গড়িয়ে দেবেন।

পৈলেন গোটা চারেক চুড়ি ততক্ষণে খুলে ফেলেছে কেটে, চমৎকার কাজ হচ্ছে। হাজু বাঁ হাত বাড়িয়ে বুড়ো লোকটার হাতঘড়ি খুলে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল, এবার গলার কাছে পাঞ্জাবির সোনার বোতামের প্রথমটা খুলে ফেলেছে। আমার কিছু করার নেই, দাঁড়িয়ে দেখছি। বলতে কী ট্রেনের কামরায় ডাকাতির কথা বিস্তর শুনলেও চোখে কখনও দেখিনি সে দৃশ্য। তাই প্রাণভরে দেখে নিচ্ছিলাম।

বুড়ি ফের দুটো হেঁচকি তুলে বুড়োর দিকে চেয়ে বলল, পিস্তলের নল মাথায় ঠেকিয়ে বোকার মতো বসে আছ কী? বোতামটা নিজেই খুলে দাও, নইলে ও মিনসে যেভাবে বোতাম খুলছে পুরনো পাঞ্জাবিটা না ফেঁসে যায়। আর প্রেশারের বড়ি থাকলে দাও তো, খেয়ে ফেলি। মাথাটা কেমন করছে। দুটো বড়ি দিয়ো।

এ সব কথাবার্তার মাঝখানেই হঠাৎ একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল কী করে। মাঝখানের ফাঁকা বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ যাবৎ একটা লোক হাকুচ ময়লা একটা চাদরে আগাপাশতলা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। এই সব গণ্ডগোলে বোধহয় এতক্ষণে কী করে তার ঘুম ভেঙেছে। চাদরটা সরিয়ে মস্ত একটা গোলপানা মুখ তুলে লোকটা তাকাল। চোখদুটো টকটকে লাল, নাকের নীচে মস্ত ভুঁড়ো গোঁফ, গালে বিজবিজে কালো দাড়ি। লাল চোখে কয়েক পলক দৃশ্যটা দেখেই লোকটা হঠাৎ ঘুমের ধন্দভাব ঝেড়ে ফেলে তড়াক করে উঠে বসে বিকট গলায় বলে উঠল, মানকে বলে সাবাস!

কথাটার অর্থ কী তা আমি আজও জানি না। কিন্তু ওই দুর্বোধ্য বিকট চিৎকারে হাজুর নার্ভ নষ্ট হয়ে গেল বুঝি। পৈলেনের পিস্তলটাও বোধহয় সে আগে বড় একটা হাতে পায়নি। পিস্তল হাতে থাকলে আনাড়িদের যেমন হয় হাজুরও তেমন হঠাৎ ফালতু বীরত্ব চাগিয়ে উঠল। বুড়োকে ছেড়ে ঘুরে হুড়ম করে আচমকা একটা গুলি ছুড়ল সে। গুলিটা গাড়ির ছাদে একটা ঘুরন্ত পাখায় পটাং করে লাগল শুনলাম। যে লোকটা চেঁচিয়েছিল সে লোকটা হঠাৎ দ্বিগুণ চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে চার দিকে দাপাতে লাগল, মেরে ফেলেছে রে, মেরে ফেলেছে রে! তখন দেখি, লোকটার পরনে একটা খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। পুটলির মতো একটা ভুড়ি সামনের দিকে দাপানোর তালে তালে নড়ছে। পৈলেন ছোরা হাতে বাঁই করে ঘুরে দৃশ্যটা দেখল। আমার আজও সন্দেহ হয়, পৈলেন লোকটাকে নির্ঘাৎ পুলিশ বলে ভেবেছিল। নইলে এমন কিছু ঘটেনি যে পৈলেন মাথা গুলিয়ে ফেলে হঠাৎ দৌড় লাগাবে। আমি আজও বুঝি না, পৈলেনের সেই দৌড়টার কী মানে হয়। দৌড়ে সে যেতে চেয়েছিল কোথায়? চলন্ত গাড়ি থেকে তো আর দৌড়ে পালানো সম্ভব নয়।

তবু ছোরাটা উঁচিয়ে ধরে পৈলেনও এক সাংঘাতিক আতঙ্কের স্বরে ‘যে ধরবি মেরে ফেলব, জান লিয়ে লেবো শশালা...জান লিয়ে লেবো-রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে বলে দিচ্ছি...’ এই বলতে বলতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খ্যাপার মতো এ দরজা থেকে ও দরজা পর্যন্ত কেন যে খামোকা ছোটাছুটি করল তা ওই জানে। কেউ ওকে ধরতেও যায়নি, মারতেও যায়নি। কিন্তু ও তখন আতঙ্কে, মাথার গণ্ডগোলে কেমনধারা হয়ে মস্ত খোলা দরজার দিকে পিছন করে কামরার ভিতরবাগে ছোরা উঁচিয়ে নাহক লোকেদের বাপ-মা তুলে গালাগাল করছিল। দরজার কাছেই সেই দুটো টিটকিরিবাজ ছেলে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেয়েছে এতক্ষণ। তাদেরই একজন, স্পষ্ট দেখলাম, আস্তে করে পা বাড়িয়ে টুক করে একটা টোকা মারল পৈলেনের হাঁটুতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটু কেতরে জোর একটা লাথি কষাল পৈলেনের পেটে। প্রথম টোকাটায় পৈলেনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরের লাথিটা সামলাতে পারল না। বাইরের চলন্ত অন্ধকারে বোঁ করে বেরিয়ে গেল, যেমন গুবরে পোকারা ঘর থেকে বাইরে উড়ে যায়।

হাজুর আনাড়ি হাতে ধরা পিস্তলটা তখন ঠকঠক কাঁপছে। পুরনো পিস্তল, আর কলকবজা কিছু নড়বড়ে হবে হয়তো। একটা ঢিলে নাটবল্টুর শব্দ হচ্ছিল যেন। অকারণে সে আর-এক বার গুলি ছুড়ল। মোটা কালো লোকটা তিড়িং করে লাফিয়ে একটা বেঞ্চে উঠে চেঁচাচ্ছে সমানে, গুলি, গুল্লি! শ্যাষ হয়ে গেলাম। প্যাটটা গেল। বুকটা গেল!

কিন্তু আমি দেখেছি, গুলিটা একটা জোনাকি পোকার মতো নির্দোষভাবে জানালা দিয়ে

উড়ে বাইরে গেছে। কিন্তু হাফ প্যান্ট পরা লোকটাকে সে কথা তখন বোঝায় কে? লোকটা এখন নিজের উরুতে থাবড়া মেরে কেবল বলছে, মানকে বলে সাবাস! আবার গুল্লি?

হাজু তখন বুড়োকে ছেড়ে হঠাৎ দুটো বেঞ্চের মাঝখানে বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে পিস্তলটা মাঝে মাঝে নাড়ে আর বলে, চেন টানবে না কোনও শুয়োরের বাচ্চা। খবরদার, এখনও চারটে গুলি আছে, চারটে লাশ ফেলে দেব।

এ সব সময়ে হামাগুড়ি দেওয়াটা যে কত বড় ভুল তা বুঝলাম যখন দেখি হাজুর মাথায় কে যেন একটা পাঁচ-সাত কেজি ওজনের চাল বা গমের বস্তা গদাম করে ফেলে দিল। বস্তার তলায় চেপটা লেগে হাজু দম সামলাতে না সামলাতেই দরজার ছেলে দুটো পাকা ফুটবল খেলাড়ির মতো দু'ধার থেকে তার মাথায় লম্বা লম্বা কয়েকটা গোল কিক-এর শট জমিয়ে দিল। কামরার অন্য ধার থেকে কদম তখন চেঁচাচ্ছে, আমাকে ধরেছে। এই শালার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করি। এই রাঁড়ের ছেলে হাজু, পিস্তল চালা শালা, লাশ ফেলে দে...।

কিন্তু তখন হাজুর জ্ঞান নেই, পিস্তল ছিটকে গেছে বেঞ্চের তলায়। দু' সেকেন্ডের মধ্যে ওধার থেকে হাটুরে মারের শব্দ আসতে লাগল। লোকজন সব সাহস পেয়ে গেছে। সোনার বোতামওলা বুড়োটাও তখন রুপো বাঁধানো লাঠি হাতে উঠে গেল ওধারে। তাকে বলতে শুনলাম, আহা হা, সবাইকেই চান্স দিতে হবে তো। অমন ঘিরে থাকলে চলে! একটু সরে দিকি বাবারা এধার থেকে, সরো, সরো...

বলতে না বলতেই কদমের মাথায় লাঠিবাজির শব্দ আসে ফটাস করে। কামরাসুদ্ধু লোক ওদিকে ধেয়ে যাচ্ছে। এধারে হাজুর মাথায় সমানে ফুটবলের লাথি, কয়েকটা গাইয়া লোক উঠে এসে উবু হয়ে বসে বেধড়ক থাপড়াচ্ছে, একজন বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে হাজুর নাকে আঙুল ঢুকিয়ে চড়চড়িয়ে নাকটা ছিঁড়ছে।

আমি বেকুবের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বুঝতে পারি, আরে! আমিও যে এদের দলে ছিলাম! বুঝেই হঠাৎ চারধারে চনমনে হয়ে তাকিয়ে পালানোর পথ খুঁজি।

ঠিক এ সময়ে সেই মোটা কালোলোকটা বেঞ্চের ওপর থেকে নেমে এসে দু'হাতে আমাকে সাপটে ধরে ফেলল। বিকট স্বরে বলল, মানকে বলে সাবাস! দেখেন তো মশয়, আমার কোথায় কোথায় গুল্লি দুটো ঢুকল। দেখেন, ভাল করে দেখেন। রক্ত দেখা যায়?

আমি খুব অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, আরে না, আপনার গুলি লাগেনি।

বলেন কী?— লোকটা অবাক হয়ে বলল, মানকে বলে সাবাস! লাগে নাই? অ্যাঁ। দুই দুইটা গুল্লি।

লাগেনি। আমি দেখেছি।

ওধার থেকে কদম আমার নাম ধরে বারকয়েক ডাক দিয়েই থেমে গেল। পাইকারি মারের চোটে তার মুখ থেকে কয়েকটা কোঁক কোঁক আওয়াজ বেরোল মাত্র। এধারে হাজুর আধমরা শরীরটার তখনও ডলাইমলাই চলছে।

মোটা কালো লোকটা ভাল করে নিজের গা দেখে-টেখে গুলি লাগেনি বুঝে নিশ্চিত হয়ে চারধারে তাকিয়ে অবস্থাটা দেখল। বোধহয় পৌরুষ জেগে উঠল তার। হাজুকে দেখে সে পছন্দ করল না। বলেই ফেলল, এইটারে আর মেরে হবেটা কী? টেরই পাবে না। চলেন, ওই ধারের হারামজাদারে দুইটা দেই।

এই বলে আমাকে টানতে টানতে ওধারে নিয়ে গেল। রুপোবাঁধানো লাঠি হাতে বুড়ো লোকটা ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কত আর পারা যায়। হাতে আবার আর্থারাইটিস।

যারা মার দিচ্ছিল তারা কিছু ক্লান্ত। দু'একজন সরে গিয়ে আমাদের জায়গা করে দিয়ে খাতির করে বলল, ভালমতো দেবেন। এদের গায়ে মারধর তেমন লাগে না।

কালো মোটা লোকটা অসুরের মতো লাফিয়ে পড়ল কদমের ওপর। মুহূর্তে কদমের মাথার একমুঠো চুল উপড়ে এনে আলোতে দেখে বলল, হেই শালা, পরচুলা নাকি?

না, পরচুলা নয়। আমি জানি। কিন্তু সে কথা বলাটা ঠিক হবে না বলে বললাম না। কালো লোকটা আমাকে কনুইয়ের গুতো দিয়ে তাড়া দিল, মারেন, মারেন! দেখেন কী?

মারতেই হল। চক্ষুলজ্জা আছে, নিজের প্রাণের ভয় আছে। একটু আস্তের ওপর দুটো লাথি কষালাম। গালে একটা চাপড়। কদমের জ্ঞান ছিল। একবার চোখ তুলে দেখল। কিন্তু কথা বলার অবস্থা নয়। গাড়ির দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে উবু হয়ে মার খেতে লাগল নাগাড়ে। তারপর শুয়ে পড়ল।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই হই রই কাণ্ড। ভিড়ে ভিড়াক্কার। সেই ফাঁকে পালিয়ে অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠলাম গিয়ে। হঠাৎ দেখি, আমার সঙ্গে সেই কালো মোটা লোকটাও উঠেছে এসে। আমাকে একটা বিড়ি দিয়ে বলল, পালিয়ে এসে ভাল কাজ করেছেন। আপনি বুদ্ধিমান। নইলে থানা-পুলিশের ঝামেলায় পড়ে যেতে হত।

আমি একটা হুঁ দিলাম। বাস্তবিকই বোধহয় আমি বুদ্ধিমান। ডাকাতের দলে আমিও যে ছিলাম সেটা কেউ ধরতেই পারল না।

কথায় কথায় লোকটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। বেশ লোক। ক্যানিংয়ের বাজারে তার আটাকল আছে, তিনটে নৌকোর মালিক। আমাকেও লোকটা পছন্দ করে ফেলল। শেষমেশ বলেই ফেলল, তোমারে তো বিশ্বাসী মানুষ বলেই মনে হয়। আমার তিনটে মালের নৌকো লাট এলাকায় খেপ দেয়। চাও তো তোমারে তদারকির কাজে লাগিয়ে দিই। মানকে বলে সাবাস! বলে খুব হাসল। গলা নামিয়ে বলে, আমার নামই মানিক। মানিকচন্দ্র সাহা, বৈশ্য। আবার বৈষ্ণবও বটে হে। বাঙাল দেশে বাড়ি। কিন্তু এতদঞ্চলে

থাইকতে থাইকতে দেশি ভাষা প্রায় ভুলে গেছি। যাবা নাকি আমার সঙ্গে? আমি লোক ভাল৷

রাজি হয়ে ক্যানিং চললাম। বরাবর দেখেছি, উড়নচণ্ডীদের ঠিক সহায়-সম্বল জুটে যায় কী করে যেন। ঘর ছেড়ে এক বার বেরিয়ে পড়লে আর বড় একটা ঘরের অভাব হয় না।

.

০৩.

ক্যানিং জায়গা ভাল। ঘিঞ্জি বাজারটার ভিতরে মানিক সাহাব আটাকল। আটাকলের পিছনেই দমবন্ধ তিনটে ঘরে তার তিন-তিনটে জলজ্যান্ত বউ থাকে। ছেলেপুলে কত তা গুনে শেষ করতে পারিনি। যে ক দিন ছিলাম সেখানে প্রায় দিনই ছেলেপুলেদের মধ্যে দু-একটা নতুন মুখ দেখতাম। তার ক'টা ছেলেমেয়ে তা জিজ্ঞেস করলে মানিক নিজেও প্রায়ই গুলিয়ে ফেলত। এক দিন আমার চোখের সামনেই রাস্তায় ঘুগনিওলার ছেলে কাদা মাখছিল, মানিক সাহা তাকে নিজের ছেলে মনে করে নড়া ধরে তুলে এনে আচ্ছাসে পিটুনি দিয়ে দিল। ভুল ধরা পড়তেই জিভ কেটে বলল, মানকে বলে সাবাস।

বড় ভাল লোক মানিক সাহা। সে নিজেও সে কথা প্রায়ই বলত, বুঝলে হে উপল, আমি লোকটা বড় ভাল। লোকে আমারে ভয় দেখায়, বলে, একের অধিক বিবাহ বে-আইনি। একদিন নাকি আমারে জেল খাটতে হবে। কিন্তু আমি কই, জেল খাটাবা খাটাও, কিন্তু আমারে মন্দ কোয়ো না কেউ। আমি তো কোনও মেয়ের সঙ্গে নষ্টামি করি নাই। বদমাইশ লোক ঘরে বউ থুয়ে অন্যের সঙ্গে নষ্টামি করে। আমি বদমাইশ না। মেয়েছেলে দেখে মাথা খারাপ হলে আমি তারে বিয়ে করে ফেলি। এইটে সাহসের কাজ, না কি ডুব দিয়ে জল খাওয়াটা সাহসের?

ঘিঞ্জি বাজারটা পার হলেই বিপুল নদী, আকাশ, ব্রিটিশ আমলের কুঠিবাড়ি। হাজার রকমের মাল বোঝাই হয়ে নৌকো যায় বাসন্তী হয়ে গোসাবা। আরও ভিতরবাগে নানা নদীনালা ধরে ধরে গহিন সুন্দরবন পর্যন্ত। নৌকোয় থেকে থেকে জোয়ার-ভাটা, গাঙের চরিত্র, মেঘ, বর্ষা, শীত সবই চিনে গেলাম। নদীর জীবনে না থাকলে পৃথিবীর কত রূপ অদেখা থেকে যেত। লাট অঞ্চলে রাস্তাঘাট নেই, মোটরগাড়ি নেই, রিকশা নেই, এমনকী সাইকেল বা গো-গাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। মাইল মাইল চষা খেতের তফাতে এক-এক খানা গ্রাম। নৌকো ভিড়িয়ে প্রায়দিনই গাঁ দেখতে চলে গেছি গভীর দেশের মধ্যে। সেখানে নিঝুম এক আশ্চর্য জগৎ। ফিরে আসতে মন চাইত না।

আমার সে-জীবনটা ভণ্ডুল করে দিল মানিক সাহা নিজেই। বাসন্তী ছেড়ে ক্যানিংমুখো নৌকো। বড় গাঙে পড়তেই ঝড়। মাল গস্ত করতে সেবার মানিক সাহা নিজেই

গিয়েছিল। খড় কিনে ফিরছে। পাহাড়-প্রমাণ বোঝাই নৌকো। মানিক হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় খালি গায়ে হালের কাছে বসে গুন গুন করে ঢপের গান গাইছে। সুরের জ্ঞান ছিল। একটু আগেই একটা পচা কাঠ কুমিরের মতো আধো ডুবন্ত ভেসে যাচ্ছিল দেখে কামঠ! কামঠ! বলে চেঁচিয়ে আমাদের সঙ্গে রঙ্গ করছিল। জোর বাতাস ছাড়তেই কিছু আলগা খড় উড়ে গেল ডাইনির চুলের মতো। আকাশে গুমগুম শব্দ। নৌকোর জোড় আর বাঁধনে একটা ক্যাচকোচ শব্দ উঠল বিপদের। জল ঘোর কালো। আকাশে ঘূর্ণি মেঘ উড়ে আসছে!

কেমনধারা অন্য রকম চোখে মানিক সাহা এক বার পিছু ফিরে দেখল। তার দু'হাত পিছনে আমি দাঁড়িয়ে, আমার পিছনে খড়ের গাদা। কিন্তু আমাকে বা খড়ের গাদাকে দেখল না মানিক সাহা। এমনকী গোঙানো জলে গহিন ছায়া ফেলে যে প্রকাণ্ড ঝড় আসছে তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করল না সে। তবু কী যেন দেখল। মাঝিরা চেঁচামেচি করছিল নৌকো সামলাতে।

মোজাম্মেল খড়ের গাদার ওপর থেকে একটা দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে নেমে এসে মানিক সাহাকে বলল, সাহাবাবু, খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ুন। ইদিক-সিদিক কিছু হলে তিন-তিনটে ঠাকরোন বিধবা হবেন।

খাকি হাফপ্যান্ট পরা মানিক সাহা উবু হয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি রইল। পুরনো পালের কাপড় হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে ফেড়ে গিয়ে নিশেনের মতো উড়ছে। নৌকো কিছু বেসামাল। মাঝিরা ডাঙার দিকে মুখ ঘুরিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু একটা ঘোলায় পড়ে নৌকোটা এগোতে চাইছে না। ওদিকে দিকবিদিক একটা ধোঁয়াটে চাদরের মতো আড়াল করে বড় গাঙ ধরে উড়োজাহাজের শব্দ তুলে ঝড় আসছে। আলগা খড় মুঠো মুঠো উড়ে যায় বাতাসে, এদিক-সেদিক পাক খেয়ে জলে পড়ে। মানিক সাহা যেভাবে উবু হয়ে বসে আছে ধারে তাতে বাতাসের তেমন চোট এলে না উলটে জলে গিয়ে পড়ে।

ভাল ভেবে আমি গিয়ে পিছন থেকে মানিক সাহার বা কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরে বললাম, মানিকদা, চলো খোলে বসে কেত্তন গাই।

মানিক সাহা মুখ তুলে, ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তার বাঁ হাতে রুপোর চেনে বাঁধা পীত পোখরাজ, গোমেদ, বৈদূর্যমণি, সিংহলের মুক্তো, চুনি নিয়ে পাঁচটা পাথর, তা ছাড়া তাগায় বাঁধা দুটি মাদুলি। আমি যেখানটায় ধরেছি তার হাত, সেখানে তাবিজ আর পাথর খজবজ করে উঠল। দেখি, মানিক সাহার দু চোখে টলমল করছে জল।

হাত বাড়িয়ে আমার গলা ধরে মাথাটা তার মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, কাজগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। না?

কী কাজ খারাপ হয়েছে, কেনই বা হল, তার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু বুঝতে পারছি, মানিক সাহার হঠাৎ কোনও কারণে বড় অনুতাপ এসে গেছে।

আন্দাজে বললাম, কেন, কাজ খারাপ হবে কেন? আমি তো কিছু খারাপ দেখি না।

মানিক সাহা কথা বলল না। সেই ঝড় বাতাসে খাকি হাফপ্যান্ট পরে, স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে উবু হয়ে বসে চোখের জলে গঙ্গার জল বাড়াতে থাকে, আর কেবল কী মনে করে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে।

ও সব কথার তখন সময় নেই। ঘুণে ধরা মাস্তুল পালের নিশেন সমেত মড়াৎ করে ভেঙে জলে ভেসে গেল। নন্দর মাথায় চোট হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে গাল ভাসিয়ে। এই তক্কে নৌকো ঘোলা পেরিয়ে একখানা চক্কর মারল। ধড়াস ধড়াস করে তিন-চারজন আমরা কুমড়ো গড়াগড়ি দিয়ে উঠে দেখি, দুনিয়া মুছে গেছে। চার দিকে বাতাসের হাহাকার শব্দ। তাল-বেতাল জল ফুলে উঠছে গহিন আঁধার গাঙে। নৌকো আকাশে উঠে পাতালে পড়ছে।

এই সব গোলমালে যে যার সামলাতে যখন ব্যস্ত তখন মানিক সাহার হাফপ্যান্ট পরা শরীর পাটাতনে চিত হয়ে পড়ে আছে। মাল্লারা নৌকো একটা ঘাটের মাটির বাঁধে প্রচণ্ড ঘষটানি লাগিয়ে ভিড়িয়ে দিল। লাফিয়ে নেমে সব দড়িদড়া আর খোটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মানিক সাহা তখনও চিত হয়ে পড়ে আছে। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির ধারালো বর্শা ফুড়ছে চার দিক। আগুনের হলকা ছড়িয়ে দড়াম দড়াম করে বাজ পড়ে কাছেপিঠে। মানিক সাহা চোখ বুজে পড়ে আছে। তাগা ছিড়ে কয়েকটা তাবিজ আর কবচ ছিটকে পড়েছে চারধারে।

আমি তাকে নাড়া দিতেই সে সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই, যেন বিছানায় শুয়ে আছে, এমন আরামে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, কাজগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে।

এ অঞ্চলের ঝড় হঠাৎ এসে হঠাৎ যায়। ঝড় থেমে গেলে দেখা গেল, খড় ভিজে নৌকো তিন গুণ ভারী হয়ে জলের নীচে মাটিতে বসে গেছে। তার ওপর ভঁটিতে এখন উলটো স্রোত। মাল্লারা ওপরে উঠে খড়ের চাপান কমানোর জন্য ভেজা খড়ের আঁটি হাতে হাতে চালান করছিল ডাঙায়। ভিজে সবাই চুস। খড়গুলো পড়ে থাকবে এখানে, কাল অন্য নৌকো নিয়ে যাবে এসে।

খোলের ভিতর আমার একটা টিনের সুটকেস আছে। তার ভিতর থেকে সস্তার সিগারেট আর দেশলাই এনে পাটাতনে মানিক সাহার পাশে বসলাম। দিব্যি ঠান্ডা হাওয়া। পরিষ্কার আকাশে ফুটফুট করছে তারা। ভেজা গায়ে উঠে বসে মানিক সাহা একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বলল, উপলভাই, বড় অপরাধ করে ফেলেছি হে। মানকে বলে সাবাস।

কিছুই বুঝতে পারছি না। ধমক দিয়ে বললাম, ব্যাপারটা কী?

সে গম্ভীর হয়ে বলে, তখন তুমি ফচ করে এসে যদি হাতটা না-ধরতে তা হলে এতক্ষণে আমার লাশ গাঙে ভাসত। যেই না মনের জ্বালায় লাফিয়ে পড়ব বলে মন করেছি অমনি তুমি এসে

শুনে ভয় খেয়ে যাই। মানিক সাহা লাফিয়ে পড়লে আগামী কাল থেকে আমার গতি

হত কী? বললাম, লাফাবে কেন?

ঝড়জলের ওই বিকট চেহারা দেখে হঠাৎ নিজের সব পাপের কথা মনে পড়ে গেল কিনা। কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

সারাক্ষণ মানিক সাহার সেই এক কথা। কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে। কী খারাপ হল, কেন খারাপ হল এ সব জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। সে রাতে লঞ্চ ধরে ক্যানিং ফিরে এসে অবধি তার মাথার জট ছাড়ল না। তারপর তিন দিন, চার দিন করে সময় যেতে লাগল। মানিক সাহা খায় দায়, হাসে, গল্প করে, কিন্তু হঠাৎ সব কিছুর মাঝখানে একটা বড় শ্বাস বুক থেকে ছেড়ে বলে, কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

মাসখানেকের মধ্যে তিনটে নৌকো বেচে দিল সে জলের দরে। আটাকল আর দোকানঘর বউদের নামে লিখে দিল। বউরা কেউ মরাকান্না কাঁদে, কেউ বিকট চেঁচিয়ে গালমন্দ করে মানিক সাহাকে। কিন্তু লোকটা নির্বিকার, কেবল বলে, কাজগুলো সব খারাপ হয়েছে।

আরও ক'দিন বাদে আমার কাছে গোপনে সে ঝেড়ে কাশল। বললে, তিন বিয়ে ভাল নয়, বুঝলে? অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে এক বিয়ে ভাল। আর এই ব্যাবসা-ট্যাবসার কোনও মানে হয় না, আসল জিনিস হল চাষবাস।

আমি ঢাকের বাঁয়া হয়ে মাথা নাড়ি।

কিছুদিন বাদে একদিন সকালে মানিক সাহা আমাকে নিয়ে দাঁতন করতে করতে বাঁধে হাঁটতে লাগল। সেদিনও তার পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গা আদুড়। খানিক দূর গিয়ে দাঁতন জলে ফেলে দিয়ে পিছু ফিরে আমাকে বলল, দৌড়োও!

বলে সে নিজে হাঁসফাস করে ছুটতে থাকে। আমার জাগতিক অবলম্বনকে ছুটতে দেখে আমিও দৌড়োই। লঞ্চ তখন ছাড়ে-ছাড়ে অবস্থা। মানিক সাহা এক লম্ফে চড়ে গেল, পিছনে আমি।

একগাল হেসে সে বলল, খুব জোর পালিয়েছি হে। তিন-তিনটে বউ যার, জীবনে কি তার শান্তি আছে? বউগুলো চারটে শালাকে আমদানি করেছে আমাকে নজরে রাখার জন্য। মানকে বলে সাবাস।

আমি বেজার মুখে বললাম, কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?

মানিক সাহা সংক্ষেপে বলল, এক বিয়ে, আর চাষবাস। আর কোনও ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

গোসাবায় নেমে মাইল পাঁচেক মাঠ বরাবর হেঁটে পাখিরালয় গাঁ। সেখান থেকে নদী পেরিয়ে দয়াপুর। সেখানে পৌছতে বেলা কাবার হয়ে গেল। গিয়ে দেখি, মানিক সাহা সেখানে আগেই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে কবে থেকে। জমিজোত কেনা হয়ে গেছে,

দিব্যি মাটির বাড়ি আর ঘেরা বাগান। লোকজন কাজকর্ম করছে। এমনকী সেখানে ডজন খানেক খাকি হাফপ্যান্টও মজুত রয়েছে।

পরদিনই মানিক সাহা বিয়ে বসল। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে ছিল আগে থেকেই। গরিবের ঘরের শ্রীময়ি একটা কালো, অল্পবয়সি মেয়ে লাজুক হেসে মানিকের বউ হয়ে গেল। নাম ঝুমুর। মানিক আমাকে চুপি চুপি বলল, এক বিয়ে, বুঝলে? এখন থেকে আর বহু বিবাহ নয়।

আমি বুঝদারের মতো মাথা নাড়ি। তখন মানিক হঠাৎ ধর্মভয়ে কাতর হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে বলো তো, ধর্মত আমি কাউকে ঠকাইনি তো, জোচ্চুরি করিনি তো কারও সঙ্গে? সকলের পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দিয়ে এসেছি তো? তারপর নিজেই কর গুনে হিসেব করে বলে, বউদের ছেলেপুলে, টাকা-পয়সার অভাব রাখিনি, এক, মহাজনের কাছেও বাকি বলে কিছু পড়ে নেই, দুই, কর্মচারীদের কারও এক পয়সা মারিনি, তিন…

দয়াপুরে দিব্যি আমার থাকা চলছিল। কাজকর্ম নেই, বসে খাও, আর চাষবাস একটু দেখাশোনা করো, কাজের লোকদের কিছু হাঁকডাক করো, বাস হয়ে গেল। সেই খিদের চিন্তাটা তেমন মাথা চাড়া দেয় না। ভাবলাম, আমার সেই খিদের ভূত বোধহয় রোজার হাতে পড়েছে।

কিন্তু মানিক সাহার নতুন বউ জ্বালালে। এক মাসের মাথায় সে আমার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি শুরু করে। সেটা মন্দ লাগত না। মেয়েছেলের সঙ্গ তো খারাপ না, সময়টা কাটেও ভাল। কিন্তু দু’মাস যেতে না যেতেই সে নানা রকম ইশারা ইঙ্গিত শুরু করল। রাত-বিরেতে উঠে আসত আমার বিছানায়।

আমি তাকে বলতাম, দেখো, মেয়েমানুষের চেয়ে আমার ঢের বেশি দরকার একটা আশ্রয়। তুমি অমন করলে একদিন ধরা পড়ব ঠিক, তখন মানকে আমাকে তাড়াবে।

ইস, তাড়ালেই হল?— বলে খুব দেমাক দেখাত। আবার কখনও বলত, চলো পালিয়ে যাই।

অত বোকা আমি নই। পালানোর কথায় পাশ কাটাতাম।

শেষতক ঝুমুরের মধ্যে একটা হন্যে ভাব দেখা দিল। কাঁচা অল্পবয়সি পুরুষমানুষের গন্ধে তার আর রাখ-ঢাক রইল না। মানিক সাহা খেত থেকে ফিরে এসে যখন জিরেন নিচ্ছে তখন আমি কত বার বলেছি, যাও বউঠান, একটু হাওয়া-টাওয়া করো, দুটো ডাব কেটে দাও?

সে তখন আমার সঙ্গে প্রায় মানকের চোখের সামনে ঢলাচ্ছে। বলত, ডাব ও নিজে কেটে নিতে পারবে না?

রাত-বিরেতে মানকে ভাল করে ঘুমোবার আগেই উঠে আসত। চোখের সামনেই দিন দুপুরে আমাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে যেত বাগানের দিকে।

টের না-পাওয়ার কথা নয় মানকের। ভাল করে দেখেশুনে সে অবশেষে একদিন গর্জন করে উঠে বলল, অসতী! অসতী।

যাদের স্বভাব খারাপ তারা টপ করে পায়ে ধরতে পারে। ঝুমুরও পায়ে ধরে কান্নাকাটি করল। প্রথম বলল, ভুল দেখেছ। পরে স্বীকার হয়ে বলল, আর হবে না এ রকম।

কিন্তু তাই কি হয়! যা হওয়ার তাই হচ্ছিল ফের।

এবার মানিক সাহা কেঁদে উঠল এক রাতে। বউয়ের হাত-পায়ে ধরে বিস্তর বোঝাল। ঝুমুরও কাঁদল, আদর করে বলল, তোমায় ছুঁয়ে বলছি, আর হবে না।

আবার হল।

তৃতীয় দফায় মানিক সাহা একদিন বউকে ধরে বেধড়ক ঠেঙাল, তারপর দেড় বেলা বেঁধে রাখল ঘরে।

কী জানি কেন এ ব্যাপারে আমাকে তেমন কিছু বলত না মানিক। মাঝে মাঝে কেবল ছানি পড়া চোখের মতো যেন ভাল ঠাহর করতে পারছে না, এমনভাবে তাকাত। এক-আধবার করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, উপলভাই, এর চেয়ে কি তিন বিয়েই ভাল ছিল?

আমি তার কী জানি। চুপ করে থাকতাম।

সে নিজেই ভেবেচিন্তে বলত, তিনটে বউ থাকলে সুবিধে এই যে, তারা পরপুরুষের কথা ভাববার সময় পায় না, একটাকে নিয়েই কাড়াকাড়ি করে। হিংসুক জাত তো! এক বিয়ের দেখছি বিস্তর ঝামেলা।

ইদানীং খুব তাড়ি খাওয়া ধরেছিল মানকে। ঝুমুর কাঁকড়ার ঝাল, মাছের চচ্চড়ি করে দিত। আমি আর মানকে সেই চাট দিয়ে জ্যোৎস্নার উঠোনে বসে সন্ধের পর খেতাম।

ঝুমুর একদিন আধ টিন পোকামারার সাংঘাতিক বিষ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আজ রাতেই নিকেশ করবে।

বোকা মেয়েমানুষ। ডাক্তার, থানা-পুলিশ, আদালত এ সব খেয়াল নেই। কিন্তু ঝুমুরের চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম, রাজি না হলে এ বিষ একদিন আমার ভিতরে কোনও কৌশলে চালান করে দেবে। একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে ও।

টিন নিয়ে গ্যাঁজানো তাড়িতে মেশাতে হল।

কী বুদ্ধি!—ঝুমুর দেখে বলল, প্রথমটায় খেলেই তো গন্ধে টের পাবে। আগে ভাল তাড়ি দিয়ে নেশা করিয়ে নেবে তারপর এটা দিয়ো। নেশার ঝোঁকে কী খাচ্ছে টের পাবে না।

ঝুমুরের বুদ্ধি দেখে আমি তখন অবাক। মেয়েমানুষ একই সঙ্গে কত বোকা আর

চালাক হতে পারে!

সন্ধেবেলা ঝুমুর বাপের বাড়ি গেল। কাল সকালে ফিরে এসে কান্নাকাটি করবে। বিধবা হবে তো!

আমি আর মানকে তাড়িতে বসলাম।

আকাশে চাঁদ ছিল না, উঠোনে একটা হারিকেন ছিল শুধু। চাঁদের অভাবে মানকে উদাস চোখে হারিকেনটার দিকে চেয়ে ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে। আমি তাকে পা দিয়ে ছোট একটা আদুরে লাথি মেরে মুখটা কাছে আনতে ইশারা করলাম। সে হামাগুড়ি দিয়ে কাছে আসতেই বললাম, বোঝো কেমন?

কী বুঝব ভাই?

শোন মানিকদা, যখন-তখন না দেখেশুনে যা-তা খেয়ে বোস না এ বাড়িতে।

কেন বলো তো?

দু’ নম্বর হাঁড়িতে বিষ মেশানো আছে।

বিষ?

বলে হঠাৎ হাফপ্যান্ট পরা মানিক লাফিয়ে উঠে হাতের ভাঁড় ছুড়ে ফেলে পেল্লায় চেঁচাতে থাকল, বিষ দিছে! বিষ দিছে! মরে গেলাম, ও বাবা রে, মরে গেলাম। আমার বুকটা কেমন করে। আমার প্যাটটা কেমন করে।

এই বলে আর সারা উঠোন জুড়ে লাফিয়ে নৃত্য করে।

হুবহু সেই ট্রেনের কামরার দৃশ্য।

হাতের ভাঁড়টা শেষ করে আমি হারিকেনটা তুলে নিয়ে রওনা দিলাম। পুঁটুলি একটা বাঁধাই ছিল।

মাঠ পেরিয়ে যখন ঘাটের কাছে পৌঁছেছি তখন পিছন থেকে মানিকও হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। কোনও কথা হল না দু’জনে। জোয়ারের জল এখন বেশ ফেঁপে আছে। পাড়ে তোলা নৌকোটা এঁটেল কাদায় ঠেলে নিয়ে জলে ফেলে দু’জনে উঠে বসলাম।

মানিক সাহা পাখিরালয়ে নেমে গেল অন্ধকারে। আমি তাকে হারিকেনটা ধরিয়ে দিলাম হাতে। সেই আলোতে দেখা গেল, তার মুখ-চোখ কেমন ভোম্বলপানা হয়ে আছে। পিছনে দিগন্তজোড়া অন্ধকার পৃথিবী, অচেনা। সেদিকে চাইল। তারপর আমাকে বলল, না ভাই, এবার পুরো ব্যাচেলার। চিরকুমার থাকব এখন থেকে।

এই বলে খাড়াই ভেঙে উঠে গেল। কোথায় গেল তা আমি আজও জানি না। আমি নৌকো বেঁধে রেখে গোসাবামুখো হাঁটা ধরলাম।

.

০৪.

বারান্দাটায় থাকতে আমার কিছু খারাপ লাগে না। শীত বা বর্ষায় একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ও সব গায়ে মাখা আমার অভ্যাস নয়।

বারান্দার বাতি নিভলেই রোজ এক অতিথি আসে। কেঁদো একটা ছুঁচো। এত স্বাস্থ্যবান ছুঁচো কদাচিৎ দেখা যায়। হুলো বেড়ালের মতো বড় চেহারার এক মিস্টার ইউনিভার্স, বেসিনের তলায় এঁটো বাসন-কোসন ডাঁই করা থাকে, সে এসেই বাসনপত্রে হুটোপাটি শুরু করে দেয়। বাতি জ্বাললেই গ্রিলের দরজার বাইরে বা জালের ফুটোর ভিতরে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। তার লোমহীন মোটা লেজটা দেখা যায়। ভারী চালাক ছুঁচো। রান্নাঘরে এক রাতে চারখানা পরোটা নিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে রেখে গেল। গোটা তিনেক নিয়ে গিয়েছিল। পরদিন ক্ষণা বারবারই সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এ কি আর ছুঁচোর কাজ! বাটির ঢাকনায় নোড়া চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। অত ভারী জিনিস সরাতে পারে নাকি ছুঁচোরা? এ অন্য ছুঁচোর কাজ। যাদের লোকে ছোঁচা বলে।

শুনে আমার একটু লজ্জা করল। ছুঁচোটার ওপর রাগও হল খুব।

এ বাড়িতে আর একটা উৎপাত আছে চড়াই পাখির। গ্রিলের ফুটো দিয়ে রাজ্যের চড়াই এসে লোহার বিমের খাঁজে রাত কাটায়। রাতে বিমের গায়ে ডিম ডিম সব চড়াই বসে নানা রকমের শব্দ করে। অসুবিধে হল তাদের পুরীষ নিয়ে। যখন-তখন লাজলজ্জার বালাই নেই, হড়াক করে খানিকটা সাদায় কালোয় ক্বাথ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। আমার বালিশ বিছানা বলতে যা একটু কিছু আছে সব দাগ-ধরা হয়ে গেল। এখন কাচলেও ওঠে না। মাঝেমধ্যে প্রথম রাতে দুটো-তিনটে চড়াইয়ের মধ্যে মাথা গরম করা ঝগড়া লেগে পড়ে। একটা আর-একটাকে খোঁচাতে খোঁচাতে দুটো-তিনটে মিলে জড়াজড়ি করে পড়ে যায় নীচে।

এ দুই উৎপাত ছাড়া এখন আর কোনও অসুবিধে নেই।

ছুঁচোটার সাহস ক্রমেই বাড়ছে। পরোটা চুরির পরদিন যেই এসেছে অমনি উঠে বাতি জ্বাললাম। একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। রোজ যেমন সুট করে পালায় সেদিন মোটেই তেমন কিছু করল না। একটু লজ্জার ভান করে কয়েক পা দৌড়ে গ্রিলের দরজার কাছে গিয়ে সামনের পায়ের মধ্যে মুখ ঘষে প্রসাধন করতে লাগল নিশ্চিন্তে।

কিছু করার নেই। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। অল্প একটু অভিমান হয়েছিল বটে ছুঁচোটার ওপর, কিন্তু সেটা বোঝার মতো হৃদয় ওর নেই।

কয়েকটা বাজারের থলি খামকা দাঁতে কেটে রেখে গেল কয়েক বার। একটা বাসি চাদর বারান্দায় পড়ে ছিল, পরদিন ঝি কাচবে, সেটা সাত জায়গায় ছ্যাঁদা হল একদিন। তা ছাড়া নাদি মেখে রেখে যায় বারান্দায় রোজ। পরিষ্কার করতে ঝি চেঁচামেচি করে। আজকাল আবার রাতে এত বেশি সাড়াশব্দ শুরু করে যে আমার ঘুম চটে যায়। বাতি জ্বেলে তাড়া দিলে চলে যায় ঠিকই। বাতি নেভালেই আসে।

ক্ষণা একটা লাঠি আমার বিছানার পাশে রেখে দিয়ে এক রাতে বলল, শুধু চেয়ে চেয়ে ছুঁচোর কাণ্ড দেখলেই তো হবে না। এটা দিয়ে আজ ওটাকে পিটিয়ে মারা চাই।

আমার কমলাকান্তের মতো অবস্থা। সে রাতে ছুঁচো মহারাজ এলে আমি নানা শব্দ সাড়া করে উঠে বাতি জ্বাললাম। ছুঁচোটার ভয় ভেঙে গেছে একেবারেই। আজকাল আমাকে দেখলে নড়েও না। কষে এক বার লাঠিটা চালালাম, সে অলিম্পিকের চালে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ক্ষণাকে শোনানোর জন্য কয়েক বার প্রবল লাঠির শব্দ আর গালাগাল করে আমিও শুয়ে পড়ি।

কয়েক রাত এইভাবে কাটলে একদিন ক্ষণা বলল, অসহ্য করে তুলল তো ছুঁচোটা। আজ বাজার থেকে ইঁদুর মারা বিষ আনবেন তো। অন্য কিছুতে হবে না।

শুনে আমার ঘাম দিল।

শেষবার বিষ দিয়েছিলাম মানিক সাহার বাড়িতে। আর বিষ-টিষ বড় একটা দেওয়া হয়নি। দুনিয়ায় ফালতু লোক বা অপ্রয়োজনীয় জীবজন্তু কীটপতঙ্গের অভাব নেই ঠিকই, তবু এই জনে জনে বিষ দিয়ে বেড়ানোর কাজটা আমার তেমন পছন্দ নয়।

দু-চারদিন গড়িমসি করে কাটিয়ে দিই। রাতে ছুঁচোটা এসে ফের হুটোপাটা শুরু করলে অন্ধকারে মাথা-তোলা দিয়ে আধশোয়া হয়ে তাকে ডাকি, এই মোটা, শুনছিস? পালা, পালিয়ে যা মানিক সাহা মতো।

ছুঁচোটা চিড়িক মিড়িক করে কী জবাবও দেয় যেন। কিন্তু ঠিক ভাবের আদানপ্রদান হয় না। নির্বোধটাকে কী করে বোঝাই যে, মানুষকে অত বিশ্বাস করা ঠিক নয়?

মশা বা ছারপোকাও আমি পারতপক্ষে মারতে পারি না। আমার বাবারও এই স্বভাব ছিল। প্রায়ই বলতেন, লেট দি লিটল ক্রিচারস এনজয় দেয়ার লিটল লাইভস। একজন মহাপুরুষের বাণী থেকে কোটেশনটা মুখস্থ করেছিলেন। আমাদের একটা পোষা বেড়ালকে মাঝে মাঝে খড়ম দিয়ে এক ঘা দু' ঘা দিয়েছেন বড় জোর, তার নিষ্ঠুরতা এর বেশি যেতে পারত না! বেড়ালটা খড়মের ঘা খেয়ে লাফিয়ে গিয়ে জানালায় উঠে বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। তার চোখে অবিশ্বাসভরে যেন বলে উঠত, ইউ টু ব্রুটাস? বাবাও তার দিকে চেয়ে খুব সবজান্তার মতো বলতেন, কেমন লাগল বল? মনে

করছিস তেমন কিছু লাগেনি? সে এখন টের পাবিনা। রাত হোক, হাড়ের জোড়ে জোড়ে টের পাবি।

বেড়ালটা টের পেত কি না জানি না, তবে বাবাকে দেখেছি, রাতের বেলা চুপি চুপি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট জলে গুলে বেড়ালকে জোর করে খাইয়ে দিতেন।

আমার কানা মাসিরও প্রাণটা ভাল ছিল। রাজ্যের কাক, কুকুর, বেড়াল, পায়রাকে ডেকে ডেকে এঁটো-কাঁটা খাওয়াতেন। এই করে করে কুকুর বেড়াল তো পোষ মেনে গিয়েছিলই, কয়েকটা কাক শালিকও তার ভক্ত হয়ে পড়ে। মাসি কোথাও বেরোলে রাস্তা থেকে গুনে গুনে এগারোটা কুকুর তার পিছু নিত। বড় রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসত। কানা মাসি যখন রান্নাঘরে বসে ছ্যাঁক ছোঁক করছে তখন চৌকাঠে এসে নির্ভয়ে কাক তাকে ডেকে কত রকম কথা বলত ক্যাও ম্যাও করে। সেসব কথার জবাবও কানা মাসিকে দিতে শুনেছি, রোসো বাছা, খিদেয় তোমাদের সব সময়ে পেটের ছেলে পড়ে গেলে তো চলবে না। বসে থাকো, ভাতের দলা মেখে দিচ্ছি একটু বাদে...

ছেলেবেলা থেকে এই সব দেখেশুনে আমার প্রাণেও একটা ভেজা-ভাব এসে গেছে।

কিন্তু সকলের প্রাণ তো আমারটার মতো পান্তা ভাত নয়। ক্ষণার ও সব দুর্বলতা নেই। তিন দিন বাদে সে আমাকে বাজারের টাকা দেওয়ার সময়ে সকালবেলাটাতেই বলে ফেলল, ফর্দ দেখে জিনিস আনেন, তবু ভুল হয় কেন বলুন তো! আজ যদি বিষ আনতে ভুল হয় তবে কিন্তু...।

বাকিটা প্রকাশ করল না ক্ষণা। কিন্তু তাতেই নানা রকম অজানা ভয় ভীতিতে আমার ভিতরটা ভরে গেল। ক্ষণার মুখে একপলকের জন্য ঝুমুরের সেই মুখের ছায়া দেখতে পেলাম বুঝি।

ক্ষণার চেহারা খারাপ নয়, আবার ভালও নয়। ওই একরকমের চেহারা থাকে, না লম্বা না বেঁটে, ফরসা না কালো। ক্ষণার মুখ নাক চোখ কান সব ঠিকঠাক। গালের মাংস বেশি নয়, কমও নয়। দাঁত উঁচুও নয়, আবার ভিতরে ঢোকানোও নয়। অর্থাৎ, ক্ষণাকে যদি কেউ সুন্দর দেখে তো বলার কিছু নেই, আবার খারাপ দেখলেও প্রতিবাদের মানে হয় না।

হাত পেতে বাজারের টাকা নেওয়ার সময়ে আজ আমি ক্ষণাকে একটু আড় চোখে দেখে নিলাম। ক্ষণাকে এক-এক সময়ে এক-এক রকম দেখায়। আজ খুব রগচটা, রসকষহীন দেখাচ্ছিল।

সুবিনয় পারতপক্ষে বাজারহাট করতে চায় না, ওসব তার অভ্যাস নেই। খুবই চিন্তাশীল, ব্যস্ত মানুষ। নিজের ঘর-সংসার বা আত্মজনদের সে চোখে দেখেও দেখতে পায় না। তার এই দেখা-টেখাগুলো অনেকটা ফিল্মহীন ক্যামেরায় ছবি তোলার মতো। শাটার টিপে যাও, ছবি উঠবে না। সুবিনয়ের ভিতরেও সেই ফিল্মের অভাব আমি টের পাই। নিজের মনোমতো কাজ ছাড়া দুনিয়ার কোনও কিছুই সে লক্ষ করে না।

বাজারের থলি হাতে যাচ্ছি, রাস্তায় সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা। সুবিনয় মস্ত লম্বা লোক, ছ’ ফুট দু’তিন ইঞ্চি হবে। গায়ের রং কালচে। স্বাস্থ্য খারাপ নয় বলে দানবের মতো দেখায়। ওর গায়ে যে অসুরের মতো শক্তি আছে সেটাও ও জানে না ভাল করে। নিজে সুন্দর কি কুচ্ছিত তাও ও খেয়াল করে কি?

এই লম্বা-চওড়া হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। যেমন কাজের নয় খুব সুন্দর বা বিখ্যাত হওয়া। যারা খুব লম্বা-চওড়া, কিংবা খুব সুন্দর দেখতে, কিংবা বিখ্যাত ফিল্মস্টার, নেতা বা খেলোয়াড় তাদের একটা অসুবিধে তারা দরকার মতো চট করে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে না, অচেনা জায়গায় পালিয়ে যেতে পারে না। তারা কী করছে না করছে তা সব সময়েই চারপাশের লোক লক্ষ করে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত গুন্ডা হল নব। সেই নব যখন রাস্তাঘাটে বেরোয় বা দোকানপাটে যায় তখন তাকে পর্যন্ত লোক ফিরে ফিরে দেখে। ভারী অস্বস্তি তাতে। এই যে রাস্তা উপচে শয়ে শয়ে লোকের যাতায়াত, এই ভিড়ে এমনিতে কেউ কাউকে লক্ষ না করুক, ভিড়ের মাথা ছাড়িয়ে তালগাছের মতো উচু মাথার সুবিনয়কে সবাই দু’পলক দেখে যাচ্ছে। সুবিনয় যদি এখন থুতু ফেলে, কি ডাবের খোলায় লাথি মারে, বা একটা আধুলি কুড়িয়ে পায় তো সবাই সেটা নজর করবে।

ঠিক এই কারণেই আমার কখনও গড়পড়তা মানুষের ওপরে উঠতে ইচ্ছে হয় না। কখনও কখনও লুকিয়ে পড়া বা পালিয়ে যাওয়ার বড় দরকার হয় মানুষের। বড় মানুষ হলে পালানোর বা লুকোনোর বড় অসুবিধে।

সুবিনয়ের ডান হাতের আঙুলে লম্বা একটা ফিলটার সিগারেট, বাঁ হাতে মাথার চুল পিছন দিকে সটাসট সরিয়ে দিচ্ছে বারবার। এটাই ওর সব সময়ের অভ্যাস।

আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল, ফিল্মহীন ক্যামেরার চোখে এক বার তাকালও আমার দিকে। কিন্তু চিনতে পারল না একদম।

আমি ওকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেছি, তখন হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিল, উপল!

দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাই।

ও খুব বিরক্ত মুখে চেয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

বাজারে।

বাজারে!

বলে সুবিনয় যেন খানিকক্ষণ বাজার শব্দটা নিয়ে ভাবল। শব্দটা কোথায় যেন শুনেছি বলে মনে হল ওর, একটু ভ্রু কুঁচকে চেনা শব্দটা একটু বাজিয়ে নিল বোধহয় মনে মনে। তারপর বলল, কিন্তু তোকে যে আমার খুব দরকার! একটা জায়গায় যেতে হবে।

বলতে কী অন্য কারও চেয়ে সুবিনয়ের ফাইফরমাশ খাটতেই আমার অনিচ্ছা কম হয়। বললাম, বাজারটা সেরে যাচ্ছি।

সুবিনয় হাতঘড়ি দেখে বলল, না, দেরি হয়ে যাবে।

তা হলে?

সুবিনয় জটিল সমস্যাটা মুহূর্তে জল করে দিয়ে বলল, আমি বরং বাজার করছি। তুই এক বার প্রীতির কাছে যা।

এই বলে সুবিনয় পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, এটা দিস।

খামে প্রীতির ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো। সুবিনয় নিজেই বলল, ডাকে দিতে গিয়ে ভাবলাম দেরি হয়ে যাবে পেতে। হাতে হাতে দেওয়াই ভাল। মুখেও বলে দিস।

কী বলব?

বলিস রবিবার।– সুবিনয়ের মুখটা খুবই থমথমে দেখাচ্ছিল।

এ সব সংকেত বুঝতে আমার আজকাল আর অসুবিধে হয় না। গত বছরখানেক এই কর্ম করছি। বাজারের ফর্দ, থলি আর টাকা ওর হাতে দিয়ে বললাম, ক্ষণা বলেছিল, ইঁদুরের বিষ আনতে।

‘বিষ’ কথাটায় বুঝি অন্যমনস্ক সুবিনয় শিউরে উঠল। বলল, কীসের বিষ?

ইঁদুরের। একটা ছুঁচো খুব উৎপাত করে।

সুবিনয় আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল বাজারমুখো। ভ্রু কোঁচকাল, মুখ গম্ভীর। হঠাৎ বলল, আমার কোম্পানিও প্রোডাকশনে নামছে।

কীসের?

পেস্টিসাইড, ইনসেকটিসাইড আর র‍্যাটকিলার। তার মধ্যে র‍্যাটকিলারটাই ইম্পর্ট্যান্ট। কত লক্ষ টন ক্রপ যেন রোজ ইঁদুরেরা খেয়ে ফেলছে, তুই কিছু জানিস?

অনেক খাচ্ছে শুনেছি।

হুঁ, অনেক। কোম্পানি বলছে এমন একটা পয়জন তৈরি করবে যা ইনস্ট্যান্ট, চিপ, ইজিলি অ্যাভেইলেবেল হবে। এখনকার র‍্যাটকিলার যেমন আটার গুলি-ফুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয় সে রকম হবে না। বিষটা ইটসেলফ ইঁদুরদের কাছে খুব প্যালেটেবল হওয়া চাই। নইলে কোটি কোটি ইঁদুর মারতে হাজার হাজার মন গম খরচ করতে হয়।

কোটি কোটি ইঁদুর নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার পরিচিত মোটা ছুঁচোটাকে নিয়েই আমার একটুখানি উদ্বেগ রয়েছে মাত্র। বললাম, বিষটা তৈরি করে ফেল তাড়াতাড়ি। অত খাদ্যশস্য নষ্ট হওয়া ঠিক নয়।

কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট জব। ও রকম পয়জন বের করতে পারলে রিভোলিউশনারি ব্যাপার হবে। প্রীতিকে বলিস কিন্তু মনে করে। রবিবার।

এই বলে সুবিনয় রাহাখরচ বাবদ পাঁচটা টাকা আমার দিকে বাতাসে ছুড়ে দিল।

লুফে নিয়ে বলি, হ্যাঁ রবিবার। মনে আছে।

খানিক এসে সুবিনয় বাজারের রাস্তা ধরল। আমি সোজা গিয়ে বাসরাস্তায় উঠে পড়ি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুবিনয় ইঁদুর মারা বিষ কিনতে ভুলে যাবে। ফর্দের প্রথমেই লেখা আছে, ইঁদুরের বিষ। কিন্তু ফর্দটা তেমন লক্ষ করবে কি সুবিনয়? ভুল হবেই।

সুবিনয়ের বেহিসেবি বুদ্ধি। যে চিঠি হাতে হাতে দেওয়া হবে তাতে পঁচিশ পয়সার ডাকটিকিটটা একদম ফালতু খরচ। আমি পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনতে পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে নিই। আর পানের জলে আঙুল ভিজিয়ে সাবধানে খাম থেকে ডাক টিকিটটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখি। যদিও আমি জন্মে কাউকে চিঠি লিখি না, তবু কখন কী কাজে লেগে যায় কে বলবে!

.

০৫.

গোলপার্কের কাছে একটা দারুণ ফ্ল্যাটে এক বান্ধবীর সঙ্গে প্রীতি থাকে। সুবিনয়ের একটু দূর সম্পর্কের শালি। এখন অবশ্য প্রীতিকে আর সুবিনয়ের শালী বলা যায় না। এইসব প্রাথমিক স্তর ওরা অনেককাল অতিক্রম করে এসেছে।

কী করে ব্যাপারটা হয়েছিল তা আমি সঠিক জানি না। তবে এটা ঠিকই যে, প্রীতি দেখতে চমৎকার। ছোটখাটো, রোগা, আর খুব ফরসা চেহারা প্রীতির। এমন একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব ওকে ঘিরে থাকে যে, রক্তমাংসের মানুষ বলে মনেই হয় না। ঘাড় পর্যন্ত বব করা হলেও ওর মাথার চুল অসম্ভব ঘন। তেলহীন, একটু রুক্ষ চুলের মাঝখানে মুখখানি টুলটুল করে। বড় দু’খানা চোখ, পাতলা নাক, পুরন্ত ঠোঁট, থুতনির গভীর খাঁজ। অর্থাৎ, সুন্দর হওয়ার জন্য যা যা লাগে সবই স্টকে আছে। বাঁ গালে এক ইঞ্চি লম্বা একটা জড়ুল আছে। অন্য কারও হলে জড়ুলটাই সৌন্দর্যহানি ঘটাত, কিন্তু প্রীতির সৌন্দর্য এমনই যে জড়ুলটাকে পর্যন্ত সৌন্দর্যের খনি করে তুলেছে।

প্রীতি কেমিস্ট্রির এম এসসি। ডক্টরেট করতে আমেরিকা গিয়েছিল চার বছরের জন্য।

যত দূর জানি, আমেরিকায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রীতি সুবিনয়ের শালিই ছিল। এমনকী মাঝে মাঝে প্রীতি তার জামাইবাবুর কাছে পড়াশুনো করতেও আসত। আমেরিকায় যাওয়ার আগে সে নাকি সুবিনয়কে বলেছিল, একা একা সাত হাজার মাইল দূরের দেশে যেতে যা ভয় করছে না জামাইবাবু! আপনি যদি সঙ্গে যেতেন তো বেশ হত।

সুবিনয় ফি বছরই এক-আধবার ইউরোপ, আমেরিকায় যায়। দু-চার-ছ' মাস থেকে আসে। যেবার প্রতি গেল তার ছ' মাসের মধ্যে সুবিনয়ও গেল আমেরিকায়। ওদের সম্পর্কটা হয়তো সেখানেই পালটে যায়। শুনেছি, সেটা বেশ খোলামেলা ফুর্তির দেশ, অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। ফিল্মহীন সুবিনয় এমনিতে মেয়েদের খুব একটা লক্ষ করে না, কিন্তু বিদেশে গিয়ে সুন্দরী শালিটির সৌন্দর্য বোধহয় সে প্রথম লক্ষ করল। যখন ফিরে এল তখন সে অসম্ভব অন্যমনস্ক আর নার্ভাস। ডক্টরেটের জন্য প্রীতি আমেরিকায় রয়ে গেছে, আর এদিকে আমেরিকা শব্দটা শুনলেই সুবিনয় চমকে ওঠে। ক'মাস চিঠি আর টেলিগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্যপরায়ণ ডাকবিভাগকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সে। আমার ধারণা, ম্যাসাচুসেটসের যে-কোনও ডাকপিয়নই প্রীতি রায় নামটা শুনলেই আজও আঁতকে উঠে বলবে, প্রীতি এগেইন। ওঃ মাই গড!

সুন্দরবন থেকে ফিরে তখন কলকাতায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে ঘুরতে টাকা ধার করার চেষ্টা করি। সুবিনয়কেও বার কয়েক ট্যাপ করলাম। ও কয়েক বারই বিনা প্রশ্নে এবং মুখ বেজার না করে ধার দিয়ে গেল। শোধ হবে না জেনেও। তারপর একদিন বলল, তুই আমার বাড়িতে এসে কয়েক দিন থাক। তোর সঙ্গে আমার দরকার আছে।

আমার মনটা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল। ঠিক এইরকমই আমি চাই। অন্যের সাজানো সুখের সংসারের এককোণে বেশ নিরিবিলিতে থেকে যাব। পোষা বেড়াল কুকুরের মতো। ঝামেলা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই।

আমি তো জেনে গেছি, দুনিয়াতে আমার আর বেশি কিছু করার নেই, হওয়ার নেই।

আমি যখন সুবিনয়ের বাড়ি প্রথম আসি তখন এই চিঠির যুগ চলছে। সেইসব চিঠির অধিকাংশই আমার নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলা। এর কিছুকাল বাদে প্রীতি ফিরে এসে কলেজে চাকরি নিল।

যাতায়াতের জন্য সুবিনয় যে রাহাখরচ দিয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় বহুগুণ বেশি। এখন মনে হতে পারে যে, সুবিনয়ের কাছে ভাঙানি ছিল না বলেই, গোটা পাঁচ টাকার নোটটাই দিতে হয়েছে তাকে। কিন্তু সুখের ব্যাপার হল, যেদিনই প্রীতির কাছে আমাকে কোনও চিঠি বা খবর নিয়ে যেতে হয় সেদিনই সুবিনয়ের কাছে ভাঙানি থাকে না, পাঁচ বা দশ টাকার নোট দিতে হয়। আর কোনও দিনই সে ফেরত পয়সা চায় না।

আমার মনে হয়, এই রাহাখরচের বহুগুণ বেশি টাকা দেওয়ার মধ্যে একটা নিঃশব্দ কাকুতি-মিনতি আছে। টাকাটা প্রায় সময়েই আমার পকেটের মধ্যে খচমচ শব্দ করে

দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে অনুরোধ করে, বোলো না, কাউকে বোলো না।

আমি বলতে যাব কোন দুঃখে! বলার কোনও মানেও হয় না। আমার সন্দেহ হয়, যদি আমি বলেও দিই তা হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে, উপলটা তো গাড়ল, কত আগড়ম-বাগড়ম বলে।

বহু কষ্টে এই গাড়লত্ব আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। ভেবে দেখেছি, চূড়ান্ত গাড়ল না হলে দুনিয়াতে টিকে থাকা মুশকিল। দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই হাফ বুদ্ধিমান হয়ে জন্মায়, তারপর কেউ কেউ পুরো বুদ্ধিমান হওয়ার বৃথা চেষ্টায় আয়ুক্ষয় করে, কেউ কেউ বিনা চেষ্টায় গাড়ল হতে থাকে। আমি বরাবর এই দু'নম্বরি দলের।

গাড়লদের সবচেয়ে বড় গুণ হল, তারা ওপর-ওপরসা দুনিয়াটাকে দেখে, আর ভাবে, দুনিয়াটা খুব স্বাভাবিকভাবে চলছে। দিন হচ্ছে, বাতাস বইছে, কীটপতঙ্গ পশু-পাখি মানুষ সব বিষয়কর্মে ব্যস্ত রয়েছে, গাছে ফুল ফুটছে, আকাশে চাঁদ উঠছে, রোজ খবরের কাগজ বেরোচ্ছে বা রেডিয়োতে গান হচ্ছে, মেয়ে-পুরুষরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর করছে। ন্যায্য জীবন যে রকম হয় আর কী! বেশ চলছে সব কিছু। গাড়লরা কখনও দুনিয়ার গায়ের এই স্বাভাবিকতার জামাটা তুলে ভিতরের খোস-পাঁচড়া, দাদ-চুলকুনি দেখার চেষ্টা করে না।

আমিও করি না। সুবিনয়ের প্রীতিকে দেওয়া এইসব চিঠি বা কথার সংকেতের মধ্যে কী জিনিস লুকিয়ে আছে তা যেমন গাড়ল পাবলিকের জানার কথা নয়, তেমনি আমিও না-জানার চেষ্টা করি।

রবিবার। রবিবার। আমার অবশ্য পুরো জীবনটাই রবিবার। স্কুল কলেজে এক হপ্তায় আরও ছটা দিন ছিল, বাস-কন্ডাক্টরি করার সময়ে হপ্তায় রবিবারটাও ঘুচে পুরো সাতটা কাজের দিন হল। তারপর সাত-সাতটা কাজের দিন জীবনের ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলে এক অচেনা মাস্টারমশাই চকখড়ি দিয়ে কেবল রবিবার কথাটা লিখে দিলেন। রোজ সেই কথাটা আমি ব্ল্যাকবোর্ড থেকে মুখস্থ করি।

রবিবার নিয়ে আমি খুব বেশি কিছু ভাবতে চাই না। সুবিনয় বা প্রীতির রবিবার কেমন সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ গাড়ল থাকতে চাই।

যে বন্ধুর সঙ্গে প্রীতি বসবাস করে তার নাম রুমা মজুমদার। হাওড়া জেলা মহিলা ভলিবল টিমের প্রাক্তন খেলোয়াড় রুমা বিদ্যুতের গতি আর বজ্রের মতো জোরালো স্ম্যাশ করে বিস্তর পয়েন্ট করেছিল এককালে। তার নামই ছিল স্ম্যাশিং রুমা। এক বার বাংলা দলেও খেলেছিল। হাওড়ায় বাস কন্ডাক্টরি করার সময়ে একবার গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে দু' দিন জিরেন নিচ্ছি, সে সময়ে ডালমিয়া পার্কে মেয়েদের ম্যাচ প্র্যাকটিস হচ্ছে। আমরা কয়েকজন চ্যাংড়া-প্যাংড়া মেয়েদের উরু দেখব বলে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। লাল রঙের খাটো প্যান্ট আর সাদা জামা পরা মস্ত চেহারার রুমাকে তখনই দেখি, উড়ন্ত বলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ আটকে আছে, চিতাবাঘের মতো লাফানোর আগে একটু কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ পাকানো শরীরটাকে হাউইয়ের মতো শূন্যে তুলে ডান বা বাঁ

হাতে হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিচ্ছে বলে, সেই বসান খেয়ে তোড়ে চোটে বলটা যেন ধোঁয়াটে মতো হয়ে যেত, চোখে ভাল করে ঠাহর হওয়ার আগেই মাটিতে মাথা ঠকে রুমাকে পয়েন্ট এনে দিত। লম্বা, কালো জোরালো চেহারা। ভাল দৌড়ত, হাইজাম্প দিত, ডিসকাস ছুড়তে পারত, গঙ্গার সাঁতারে কয়েকবার জিতেছে। এখন সরকারি দফতরের ছোট অফিসার। খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছে। মাঝেসাঝে একটু-আধটু সাঁতরায় বা টেবিল টেনিস খেলে। অফিসে তার অধস্তনরা তাকে যমের মতো ভয় খায়।

রুমার চেহারাটা একটু বন্য প্রকৃতির হলেও আর মুখে একটু মেদহীন চোয়াড়ে ভাব থাকলেও ভয়াবহ কিছু নেই। বরং আর পাঁচটা লাফঝাঁপ করা মেয়ের তুলনায় সে দেখতে ভাল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে এমন এক তাচ্ছিল্য আর ঠোঁটে এমন এক বক্র হাসি যে মুখোমুখি হলেই কেমন এক অস্বস্তি হতে থাকে। আর মুশকিল এই যে, পুরুষদের সে দু'চোখে দেখতে পারে না। উইমেনস লিব-এর সে একজন গোঁড়া সমর্থক। ছেলে-মেয়েদের প্রেম ভালবাসাকে সে পশুর মতো আচরণ বলে মনে করে। অসম্ভব সিগারেট খায় রুমা। দিনে তিন প্যাকেট। ধোঁয়া দিয়ে নিখুঁত রিং ছাড়তে পারে।

পাড়ার বখাটেরা পর্যন্ত রুমাকে আওয়াজ দেয় না। এক বার একটি ফাজিল ছোড়া তাকে 'ক্লিওপেট্রা' বলে ডেকেছিল, রুমা তাক রামকৃষ্ণ মিশনের কাছ থেকে ধাওয়া করে রেল লাইন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্য ছেলেটা ডাউন ট্রেনে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

রুমা মজুমদারের জন্যই প্রীতির দোতলার এই ফ্ল্যাটে আসতে আমার কিছু ভয় ভয় করে। প্রথম দিন আমাকে দেখেই রুমা খুব রক্ত-জল করা ঠান্ডা গলায় বলেছিল, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো! মুখটা চেনা-চেনা লাগছে!

সেই শুনে ভয়ে আমি সিঁটিয়ে যাই।

হয়েছিল কী, সেই ডালমিয়া পার্কে দু'দলের ম্যাচ প্র্যাকটিসের সময় দু-চারজন সুযোগ সন্ধানী মতলববাজ দর্শক উপস্থিত ছিল। প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোক সব। ময়দানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের হকি খেলা দেখতে যারা ভিড় করে তাদেরই সমগোত্রের লোক। খুব বাহবা বা হায় হায়। দিচ্ছিল খেলা দেখে, যেন ও খেলার ওপর দেশের সম্মান নির্ভর করছে। যেই রুমার দল শেষ সেট জিতে ম্যাচ নিল অমনি সেই ভদ্রবাবুরা দৌড়ে গিয়ে কোর্টে ঢুকে যে যাকে পারে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানানোর চেষ্টা করেছিল। একজন লোক মেয়েদের চুমু খাওয়ারও চেষ্টা করে। মেয়েরা অতিষ্ঠ হয়ে রাঙামুখে পালানোর চেষ্টা করছে। সেই দেখে হঠাৎ হরির লুটের গন্ধ পেয়ে আমি বিনি মাগনা একটা মেয়েছেলের গা ছোঁব বলে নেমে পড়েছিলাম। কপাল মন্দ। আমি হাতের সামনে এই রুমাকেই পেয়ে গিয়েছিলাম, যে কিনা এক নম্বরের ম্যানহেটার। সাবাস বলে চেঁচিয়ে যেই তাকে ধরতে গেছি অমনি কসরত করা মেয়েটা এক পা পিছিয়ে চটাং করে একটা চড় মেরেছিল বাঁ গালে। আমার মাথাটা ভলিবলের মতোই সেই স্ম্যাশে জমি পর্যন্ত নেমে গেল, সেইসঙ্গে আমার গোটা শরীরটাও।

কাজেই আমি রুমাকে কখনও দেখেছি বলে স্বীকার করিনি। বলেছি, কোথায় আর

দেখবেন। আমি তো হাওড়ার লোক নই।

সেই রুমাই আজ দরজা খুলল। পরনে গোলাপের ছাপওলা হাউসকোট, বুকের দিকটায় তিনটে বোতাম লাগানো নেই বলে হাউসকোটের তলায় স্পোর্টস গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। গেঞ্জির সহনশীলতাকে চরম পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে ওর বুকের দুর্দান্ত মেয়েমানুষি।

ভয় খেয়ে চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে তাকাই।

নিরুত্তাপ গলায় রুমা বলে, কী খবর?

রুমা সুবিনয়ের চিঠির খবর জানে না। সে জানে, আমি প্রীতির দিদির বাড়ি থেকে খোঁজ নিতে আসি। কিন্তু এই ঘন ঘন আসাটাকে সে বড় ভাল চোখে দেখে না।

আমি নিচু স্বরে বলি, ক্ষণা পাঠাল।

রুমা তেমনি উদাস স্বরে বলল, প্রায়ই পাঠাচ্ছে। আসুন ভিতরে, প্রীতি আছে।

বলে রুমা সামনের ঘর দিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল। একটু বাদেই ও-ঘর থেকে স্টিরিওতে ট্যাংগো নাচের বিকট জোর বাজনা শুনতে পেলাম। ট্যাংগো কি না তা আমি সঠিক জানি না, জোরালো বিদেশি বাজনা মাত্রই আমার কাছে ট্যাংগো।

সামনের ঘরটায় প্রীতি থাকে। ঘরের দুটি দিক বুক-শেলফ বোঝাই। এক ধারে সিঙ্গল খাট, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ঘোরানো যায় এমন চেয়ার। মস্ত আলমারির একটা আধ-খোলা পাল্লা দিয়ে ভিতরে শাড়ির বন্যা দেখা যাচ্ছে। মেঝেয় একটা টমেটো রঙের নরম উলের কার্পেট, সেখানেও বই-খাতা পড়ে আছে।

প্রীতি টেবিলে ঝুঁকে কিছু লিখছিল। সম্প্রতি এক কলেজের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট হয়েছে সে। বড়লোকের মেয়ে হওয়ায় দেদার টাকা ওড়াতে পারে।

আমি ঢুকতেই দেখি প্রতি তার স্বপ্নঘেরা মুখখানা ফিরিয়ে দরজার দিকেই চেয়ে আছে। হাতের কলমটা নিক্ষেপে উদ্যত ছুরির মতো ধরা। প্রীতি দেখতে যতই সুন্দর হোক, রাগলে ওর কালো জড়ুলটা লালচে হয়ে যায়, এটা ক'দিন লক্ষ করেছি। আজও জড়ুলটা লালচে দেখাচ্ছিল।

আমি খুব বেশি সাহস পেলাম না কাছে যাওয়ার। ঘরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুখে একটু বিনীত হাসি নিয়ে এগিয়ে ব্রেক কষলাম।

প্রীতি খুব বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু আমার কাজ তো আমাকে করতেই হবে। চিঠিটা বের করে দূর থেকে একটু আলগা হাতে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, রবিবার।

রবিবার কী?— প্রীতি দাঁতে কলমটা কামড়ে ঠান্ডা চোখে চেয়ে বলল।

আমি আর জানি না। বললাম।

প্রীতি চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, আপনারা দু'জনেই পাগল। জামাইবাবুকে বলবেন, রবিবার নয়, কোনও বারই না। আমি আর এ সব প্রশ্রয় দেব না।

আমি ফের বললাম, রবিবারটা মনে রাখবেন।

বলেই পিছু হটে দরজার নাগালে পৌঁছে যাই প্রায়। প্রীতি চিঠিটা নেড়ে আমাকে ডেকে বলল, উপলবাবু, একটু শুনুন।

আমি দাঁড়াই। প্রীতি উঠে কয়েক পা কাছে আসে, তারও পরনে হালকা গোলাপি রঙের হাউসকোট। বোতাম সব লাগানো। পিছনে হাত রেখে সে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, আপনি তো জানেন, জামাইবাবু এ সব চিঠিতে আবোল-তাবোল সব কথা লেখেন। জানেন তো।

না। আমি কখনও খুলে পড়িনি। ভয়ে ভয়ে বলি।

পড়েননি!-বলে প্রীতি যেন একটু চিন্তিত হয়, বলে, পড়েননি কেন?

যাঃ, পরের চিঠি পড়ে না, কেন খুব যা-তা লেখে নাকি?

প্রীতি চিঠিটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, আমি এটা এখনও পড়িনি। পড়বার ইচ্ছেও নেই। আপনি বরং পড়ে দেখুন। উনি একদম পাগল হয়ে গেছেন। এরপর আমি ক্ষণাদিকে জানাব।

একটু ভড়কে যাই। গলা খাঁকারি দিয়ে বলি, এ চিঠিটা হয়তো অনুতাপের। পড়ে দেখুন না!

প্রীতি খুব করুণ হেসে বলল, বেচারা!

কে?

আপনি।

প্রীতি চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মাথার খাটো চুল দু'হাতে পেছনের দিকে সরিয়ে চুলের গোড়া মুঠো করে ধরে রইল খানিকক্ষণ। খুবই মনোরম ভঙ্গি। নানা উদবেগ সত্ত্বেও আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। প্রীতি আমার মুখের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থেকে বলল, অনুতাপের চিঠি হলে রবিবার কথাটা মুখে বলে পাঠাত না। উপলবাবু, আপনি কি রবিবার কথাটারও অর্থ জানেন না?

আমি যথেষ্ট গাড়ল হওয়ার চেষ্টা করে বলি, সপ্তাহের সপ্তম দিন।

প্রীতি গভীর শ্বাস ফেলে বলে, বেচারা!

কে?

আপনি?

কেন?

রবিবার কথাটার অর্থ অত সহজ নয়। জামাইবাবু চান, রবিবারে আমি একটা বিশেষ জায়গায় ওঁর সঙ্গে দেখা করি। আপনাকে দিয়ে ও অনেক বারই অনেক কথা বলে পাঠিয়েছে। যেমন কার্জন পার্ক কিংবা বিজলি সিনেমায় ছ'টার শো কিংবা স্যাটারডে ক্লাব। আপনি কি কখনও এ-সব কথা ডিসাইফার করার চেষ্টা করেননি?

না। তবে খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম।

বসুন। আপনাকে কয়েকটা কথা বলব।

বলে প্রীতি তার নিজের ঘুরন্ত চেয়ারে ফিরে গেল। আমি একটা টুল গোছের গদি-আঁটা নিচু জিনিসের ওপর বসলাম। কত রকম আসবাবপত্র আছে দুনিয়ায়, সবগুলোর নাম কি আর জানি! যেটার ওপর বসেছি সেটা কী বস্তু তা আজও জানা নেই।

প্রীতি চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে বলল, কোম্পানি থেকে জামাইবাবুকে সাউথ এন্ড পার্কে একটা দারুণ ফ্ল্যাট দিয়েছে, আপনি জানেন?

আমি মাথা নিচু করে রাখি। দুর্ভাগ্যবশত ফ্ল্যাটের কথা আমি জানি এবং এমনকী সুবিনয়ের নির্দেশমতো সেই ফ্ল্যাটটা নানা আসবাবপত্র দিয়ে আমাকেই সাজাতে হয়েছে। প্রায়ই সেখানে সুবিনয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়।

প্রীতি আমার অপরাধবোধের ভাবটা লক্ষ না করেই বলল, ফ্ল্যাটটা এখান থেকে খুব দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ফ্ল্যাট পেয়েও জামাইবাবু সেখানে তার ফ্যামিলি শিফট করেনি। কেন জানেন?

আমি গলা খাঁকারি দিই। পাশের ঘরে ট্যাংগো থেমে গেছে। পরদা সরিয়ে এক বার দরজার ফ্রেমে রুমা এসে দাঁড়াল, বলল, এনি ট্রাবল প্রীতি?

প্রীতি ঘাড় নেড়ে বলল, না।

তা হলে আমি বাথরুমে যাচ্ছি। বলে চলে যাওয়ার আগে খুব কুট সন্দেহের চোখে রুমা আমাকে এক বার দেখে নিল। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। বাঙালি মেয়েরা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

প্রীতি একটু দুষ্টু হেসে বলল, আপনি এলেই রুমা ও ঘরে স্টিরিয়োতে লাউড মিউজিক

বাজায় কেন জানেন?

না তো! তবে বাজায় লক্ষ করেছি।

ওর ধারণা, আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসেন।

বুকটা কেঁপে গেল। আমি এবার সত্যিকারের গাড়লের মতো বলে ফেললাম, মাইরি না।

বেচারা! প্রীতি বলল।

কে?

আপনি।

এই নিয়ে এ ডায়লগ তিন বার হল। আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

প্রীতি বলল, রুমা প্রেম-ট্রেম দুচোখে দেখতে পারে না। তাই পাছে আপনার আর আমার প্রেমের কথাবার্তা ওর কানে যায় সেই ঘেন্নায় আপনি এলেই ও স্টিরিয়ো চালায়। বেচারা!

কে?

রুমা।

আমি স্বস্তির শ্বাস ফেলি।

প্রীতি গভীর অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল, তবু তো রুমা আসল ব্যাপারটা জানে না। যদি জানত, একজন লোক যার স্ত্রী এবং সন্তান আছে, সে সব ভুলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে তা হলে বোধহয় সুইসাইড করে বসত।

আমিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর কী করব? প্রীতি এই কদিন আগেও এত ভাল মেয়ে ছিল না। সুবিনয়কে লেখা ওর বেশ কিছু চিঠি আমি হাতসাফাই করেছি। গত সপ্তাহেও সুবিনয়ের ফ্ল্যাটের ঠিকানায় প্রীতির চিঠি গেছে। সুবিনয়টা নিতান্ত গাড়ল, প্রীতির চিঠিপত্র সে যেখানে-সেখানে বেখেয়ালে ফেলে রাখে। ক্ষণা কখনও খুলে পড়লে সর্বনাশ। কিন্তু অসময়ে কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি কয়েকখানা চিঠি সরিয়ে রেখেছি। সেগুলো আমার কানা মাসির কাছে জমা আছে।

প্রীতি বলে, হ্যাঁ, সেই ফ্ল্যাটটার কথা। জামাইবাবুর খুব ইচ্ছে আমাকে নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে সংসার পাতে। তার জন্য ক্ষণাদিকে ডিভোর্স করবে বলেও ঠিক করেছে। যত দিন ডিভোর্স না হয় তত দিন আমার সঙ্গে এ রকম রবিবারে রবিবারে ওই ফ্ল্যাটে কাটানোর খুব শখ জামাইবাবুর।

আমি যথেষ্ট লজ্জিত হওয়ার ভান করি।

প্রীতি বলল, বেচারা!

কে?

জামাইবাবু! ম্যাসাচুসেটসেও আমাকে ভয়ংকর জ্বালাতন করতে শুরু করেছিল। তারপর ফিরে এসে এত চিঠি লিখেছিল যে সে চিঠি সব পড়তে গেলে রিসার্চ বন্ধ করতে হয়।

আমি মুখভাবে সমবেদনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। যদিও জানি, এটা প্রীতির আসল কথা নয়। অন্য একটা কিছু আছে এর মধ্যে।

প্রীতির ঘোরানো চেয়ারটা খুব ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে ঘুরে যাচ্ছিল। ভ্রূ কুঁচকে কী একটু ভাবতে ভাবতে প্রীতি আস্তে করে বলল, ওকে বুঝিয়ে বলবেন, এ হয় না। আমি অবশ্য এ সব নোংরামি থেকে পালানোর জন্য আবার আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। মিনেসোটার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও হাতে এসেছে।

বলে টেবিলের বইপত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বার আগে প্রীতি একটু হেসে বলল, আপনি অত বোকা সেজে থাকেন কেন বলুন তো! এ সব কি আপনি টের পেতেন না। আপনিই জামাইবাবুর মিডলম্যান, আপনার জানা উচিত ছিল।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বলি, আজ তা হলে আসি।

প্রীতি বলল, আসি-টাসি নয়। বলুন যাই। আর আসার কোনও প্রভিশন না-রাখাই ভাল। আপনিও খুব ভাল লোক নন উপলবাবু।

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম।

প্রীতি বলল, বেচারা!

কে?

আমি নিজেই।

আমি সকালে তেমন কিছু খাইনি, ক্ষণা দুটো বিস্কুট দিয়ে চা দিয়েছিল। সুবিনয় আজকাল ফ্যাট হওয়ার ভয়ে আর কর্মক্ষমতা এবং যৌবনরক্ষার জন্য খাওয়া-দাওয়ার খুব কাটছাট করেছে। সেই মাপে আমারও খোরাক কমাচ্ছে ক্ষণা। কিন্তু আমার ফ্যাটের বা কর্মক্ষমতার বা যৌবনহানির কোনও ভয়ডর নেই, আমার বাস্তবিক খিদে পায়। এখনও পেয়েছে। প্রীতিদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে নিজের ভিতরে মাঠের মতো মস্ত ধু ধু খিদেটাকে টের পেয়ে অসম্ভব খেতে ইচ্ছে করছিল। অনেকক্ষণ ধরে গোগ্রাসে খেলে তবে যেন খিদেটা যাবে। মুখ রসস্থ, শরীরটা চনমনে।

পকেটে পাঁচ টাকার কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। রেস্টুরেন্টে বসে খেলে এক লহমায় ফুরিয়ে যাবে, পেটও ভরবে না। এ সব ভাবতে ভাবতে আধাআধি সিঁড়ি নেমেছি, এ সময়ে তলার দিক থেকে আর-একটা লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। অল্প বয়সের যুবক, ভীষণ অভিজাত আর সুন্দর চেহারা। খুব লম্বা-চওড়া নয়, কিন্তু ভারী ছমছমে শরীর তার। পরনে হাঁটুর কাছে পকেটওলা নীলরঙের জিনস, গায়ে ক্রিমরঙা দুটো বুক পকেটওলা একটা জামা, পায়ে সম্বরের গোড়ালি-ঢাকা বুট, চোখে একটা বড় চশমা, হাতে মস্ত একটা ঘড়ি, ঘাড় থেকে স্ট্র্যাপে একটা ব্যাগ ঝুলছে। এক পলকেই বোঝা যায়, এ লোকটা বিদেশে থাকে, বা সদ্য বিদেশ থেকে এসেছে। শিস দিতে দিতে তরতর করে উঠে আসছিল, আমার মুখোমুখি পড়ে এক্সকিউজ মি বলে দেয়ালের দিকে সরে গেল। তার মুখে একটু মেয়েলি কমনীয়তা আছে, খুব ফরসা রং, চোখের দৃষ্টির মধ্যে যে সুদূরতা মিশে আছে তা দেখলে বোঝা যায়, এ খুব পড়াশুনা করেছে বা করে। ব্যাগের গায়ে লেখা প্যান-অ্যাম। আমাকে পেরিয়ে ওপরে উঠে গেল যুবকটি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, প্রীতিদের আধ-খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যুবকটি ভালবাসার গলায় ডাক দিল, প্রীতি!

আমি তাড়াতাড়ি নেমে আসতে থাকি। আমি চাই না, প্রীতি এই অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলুক। নামবার সময়ে ভাবতে থাকি, যদি কখনও এই যুবকটির সঙ্গে সুবিনয়ের মারপিট লাগে তবে কে জিতবে! সুবিনয়েরই জেতবার কথা, যদি এ ছোকরার কোনও মার্কিন প্যাঁচ ফ্যাঁচ জানা না থাকে।

কিন্তু পৃথিবীর সুখী মানুষদের এ সব প্রেম-ভালবাসার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা আমার এখন নয়। খিদেটা অসম্ভব চাগিয়ে উঠেছে। খিদের মুখে সবসময়ে খাবার জুটবে এমন বাবুগিরির অবস্থা আমার নয়। খিদে পেলেও তা চেপে রাখার অভ্যাস আমার দীর্ঘকালের। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয়, খাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠি। তখন সব রকম রীতিনীতি ভুলে কেবল একনাগাড়ে গবগব করে খেতে ইচ্ছে করে।

খিদের মুখে মাসির কথা আমার মনে পড়বেই।

০৬.

মেডিকাল কলেজের উলটো দিকে আরপুলি লেন দিয়ে ভিতরে ঢুকে মধু গুপ্ত লেন ধরে এগোলে প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ি। বাড়ি প্রকাণ্ড হলেও শরিকানার ভাগাভাগি আছে। তবে সামনের দিকের বড় একটা অংশই বড়বাবুর দখলে। বাড়ির সামনে বড় একটা দরজা, দরজার দুদিকে চওড়া টানা দুটো রক। বাঁ দিকের রক বড়বাবুর, ডান দিকের রক ছোটবাবুর। বাইরের লোকজনের লিমিট এই রক পর্যন্ত, এর ভিতরে আর বড় কেউ একটা ঢুকবার অনুমতি পায় না। প্রায়ই দেখি, কেউ দেখা করতে এলে বড়বাবু তার রকে বা ছোটবাবু তার রকে এসে দাঁড়ান। দু'ভাইয়ের রং ফরসা টকটকে, বেশি লম্বা না হলেও পেট কাধ বুক-পায়ের গোছা নিয়ে বিশাল চেহারা, পরনে গামছা, খালি গা ও পা। রকে রাজারাজড়ার মতো বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়ান, প্রয়োজন হলে ঘন্টার পর ঘণ্টা তেমনি দাঁড়িয়ে কথা বলেন, কখনও অভ্যাগতকে ভিতর বাড়িতে নেওয়ার নাম করেন না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, গামছা পরে আছেন কেন, তা হলে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সকালে বা বিকেলে দু' ভাই-ই একই উত্তর দেন, এই তো, এবারে গা ধুতে যাব।

আসলে গা ধুতে যাওয়ার কথাটা স্রেফ মামদোবাজি। আমি জানি দু' ভাই-ই বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে সবসময়ে গামছা পড়ে থাকেন। অবশ্য তাদের গামছার প্রশংসা না করাটা অন্যায় হবে। তারা যে গামছা পরে থাকেন তা বাজারের সেরা জিনিস।

বড় ভাই গিরিবাবু এক সময়ে দারুণ ঘুড়ি ওড়াতে পারতেন, এখন পায়রা পোষেন, পাশা খেলেন। চেহারার মধ্যে একটা সব পেয়েছির তৃপ্ত ভাব। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখাই যে জীবনের সব সার্থকতার মূলে তা বোঝাতে থাকেন।

এ বাড়িতে আমিও বহু বার রক থেকে ফিরে গেছি। আজকাল অন্দরে ঢুকতে বাধা হয় না। বিয়ে-পৈতে-পাল-পার্বণ বা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য হলেও মাসি আমাকে নেমন্তন্ন জুটিয়ে দেয় এ বাড়িতে। সেই থেকে ভিতর বাড়িতে ঢোকার ভিসা পাওয়া গেছে। মিথ্যে বলব না, বড়বাবু, ছোটবাবু বা এ বাড়ির অন্যসব পুরুষদের কিছু বংশগত বদ দোষ আছে। কিন্তু এ বাড়িতে যখন নেমন্তন্ন করে কাউকে খাওয়ানো হয় তখন আয়োজন দেখে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়। ছ' রকমের ভাজা, শুকতুনি, দু'রকম ডাল, তিন ধরনের মাছ, মাংস, ডিম, চাটনি, দই মিষ্টির সে এক দিশেহারা ব্যাপার। কিন্তু অসুবিধে হল, আমি যখন এই প্রলয়ংকর ভোজের ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি তখন আমার পাশে বসেই অনর্গল কথা বলতে বলতে বড়বাবু এবং নিস্তব্ধ মুখে বড়বাবুর ছানাপোনারা অতি সাধারণ ডাল তরকারি মাছের ঝোল দিয়ে সাদামাটা খাওয়া সেরে মাথা নিচু করে বসে আছে। এ বাড়ির এই নিয়ম। বাইরের লোকের জন্য এক আয়োজন, বাড়ির লোকদের জন্য আর-

এক। মাসি আমাকে একবার কানে কানে সাবধান করে দিয়েছিল, খেতে বসে এ বাড়িতে কিন্তু কোনও পদ আর-এক বার চাসনে। ওদের বাড়তি জিনিস থাকে না।

যা যা থাকলে মেয়েদের সুন্দর বলা যায় তার যদি একটা বিশ দফা ফর্দ করা হয় তবে তার মধ্যে ষোলো দফাই বড়বাবুর মেয়ে কেতকীর সঙ্গে মিলে যাবে। গায়ের রং বড়বাবুর মতোই ফরসা, চেহারা লম্বাটে গড়নের, মুখখানা এত মিষ্টি যে মনে হয় পিপড়ে ধরবে। ভারী একটা সরল মুগ্ধতার হাবভাব আছে তার মধ্যে। যার দিকে চায়, যেদিকে চায় তাকেই বা সেটাকেই যেন ভালবেসে ফেলে। এই বিভ্রান্তকারী দৃষ্টি যার ওপর পড়ে সেই ভুল করে ভেবে ফেলতে পারে যে, কেতকী তার প্রেমে পড়েছে। গয়লা শিউপূজন থেকে শুরু করে পাড়ার ছেলেছোকরা এবং এমনকী আমি পর্যন্ত ভাবি। কেতকীর কটাক্ষের প্রভাব ক্যানসারের মতো সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। ট্রেনের কামরায় বা বাসের জানালায় যারা একঝুকে তার চোখে চোখ রাখতে পেরেছে তাদের কেউই বোধহয় আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। এইরকম হিসেব ধরলে সারা কলকাতায় এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে কেতকীর প্রেমিক অগুনতি। কেতকীর নামে ডাকে এবং হাতে রোজ যত চিঠি আসে তার হিসেব এবং ফাইল রাখতে একটা পুরো সময়ের কেরানি দরকার।

বড়বাবু কেরানি রাখেননি, তবে কেতকীর ভাইদের অবসর সময়ের একমাত্র কাজ হল চিঠিধরা। দরজার ফাঁকে, জানালার ফোকরে, ডাকবাক্সে, বইয়ের ভাঁজে, ঘরের জলনিকাশী ফুটোয়, ভেন্টিলেটারে সর্বদাই তারা চিঠি খুঁজছে এবং পাচ্ছে। এমনকী ছাদে ঢিল বাঁধা চিঠিও প্রতি দিনই বেশ কিছু এসে পড়ে। প্রেমিকদের প্রাবল্য দেখে বড়বাবু একসময়ে ঠিক করেছিলেন কেতকীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু কেতকী পড়াশুনোয় সাংঘাতিক ভাল হওয়ার ফলে সেটা আর হয়নি। কেতকী এখন এম এ পাশ করে মঙ্গলকাব্যে নারীর সাজ নিয়ে রিসার্চ করছে। দুটো গুমসো গুমসো ভাই সঙ্গে করে ইউনিভার্সিটি বা লাইব্রেরিতে নিয়ে যায় নিয়ে আসে।

আজ ছোটবাবুর রকে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। নতুন রাঙা গামছায় তার চেহারার বড় খোলতাই হয়েছে। বাঁ হাতে তেলের শিশি থেকে ফোটা মেপে ডান হাতের তেলোয় তেল নিয়ে চাদিতে পালিশওলা ছোকরা যেমন বেগে বুরুশ চালায় তেমনি ঘষছেন। এ বাড়ির পুরুষরা চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারেন না, আমাকে দেখেও ছোটবাবু বিকট চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাই যা উপলচন্দোরকে দেখছি যেন! অ্যাঁ!

ছোটবাবুর পায়ের ডিম দেখে অবাক মানতে হয়। গোদ নেই, তবু পা কী করে অত মোটা হয় তা গবেষণার বিষয়। ছোটবাবুও আমার চোখ দেখে ব্যাপারটা ধরে ফেলে তেমনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এ আর কী দেখছ ভায়া, সে বয়সে দেখলে ভিরমি খেতে। এমন মাসল ড্যানসিং করেছি যে জজ ব্যারিস্টার পর্যন্ত দেখতে এয়েছে।

অমায়িক হেসে বড়বাবুর অংশে ঢুকতে ঢুকতে শুনি, ভিতরে বড়বাবু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছেন, অ্যাঁ, ডিম এনেচ্যা! ডিমের গুষ্টির তুষ্টি করেছি। যা ফেলে দিগে যা। কাল থেকে পোনা মাছের টক খাব বলে পই পই করে বলে রাখলুম, গুষ্টির মাথা গুচ্ছের ডিম এনে দাঁত বের করছিস কোন আক্কেলে রা!

দালানে গিয়ে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায়, এ বাড়িতে এখনও পুরুষদের প্রাধান্য। মেয়েদের দাপট অতটা নেই। বড়বাবুর এত চেঁচামেচিতে বড়গিন্নির গলার কিছু সরু শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল মাত্র।

অফিসের সময় হয়েছে, বড়বাবু খুব দাপুটে পায়ে দালান কাপিয়ে কলঘরে যাওয়ার সময়ে আমাকে দেখে যাওয়া না-থামিয়েই বলতে বলতে গেলেন, উপল-ভাগ্নে যে! খবর সব ভাল তো! সাত-সকালে দেখো গে যাও গোবিন্দ গুচ্ছের অযাত্রার ডিম এনে ফেলেছে। পাখি-পক্ষীর ডিম খেয়ে মানুষ বাঁচে, বলো? বাঙালির শরীরে মাছ ছাড়া রক্ত হয়, শুনেছ? বলেছি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে।

কলঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তবু ভিতর থেকে জলের শব্দের সঙ্গে চেঁচানি আসতে লাগল, পয়সা মেরেছে। হিসেব নিয়ে দেখো না। আজকাল বিড়িটিড়ি ফুঁকছে তো।

রান্নাঘরের দিক থেকে বড়গিন্নির স্বর প্রবল হল, ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় করতে হয় ছেলেকে। ডিম-ডিম করে দিনরাত পাগল কবে খেলে! যা গিয়ে এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়।

কলঘর থেকে বড়কর্তা তখনও চেঁচাচ্ছেন, আরে, আমি বলেছি তো, ওর পকেট-টকেট ঝেড়ে দেখো গে। লায়েক হয়েছে, পয়সা চিনেছে। দু-চার পয়সা এদিক-ওদিক বাজার থেকে আমরাও বয়সকালে করেছি। তা বলে পোনা মাছের বদলে বাপের জন্মে ডিম আনিনি বাবা। দাও ওর মুখে কাঁচা ডিম ঘষে।

রান্নাঘর থেকে গিন্নি গলার রগ ছিড়ে এবার চেঁচান, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা ফেরত দিতে না পারবি তো। তেঁতুল গুলে, ফোড়ন সাজিয়ে বসে আছি, মাছ এলে রান্না হবে, উনি খেয়ে আপিস যাবেন, বেলা সাড়ে ন'টায় থলি দুলিয়ে বাবু এলেন। ঝ্যাঁটা, ঝ্যাঁটা—

তাড়া খেয়ে বড়বাবুর গুমসো মতো বড় ছেলে গোবিন্দ দালানে বেরিয়ে এল। আকাট মুখর মতো রাঙামুলো চেহারা। পাজামা আর নীল শার্ট পরা ছেলেটা ডিম ফেরত দিতে যাওয়ার সময়ে আমাকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে ভ্যাবলা মতো হেসে চলে গেল। চেহারার মধ্যে বংশের ছাপ পড়ে গেছে। বড়বাবুর চার ছেলের মধ্যে কেউই পকেটে কখনও পয়সা নিয়ে বেরোয় না, নিতান্ত বাস বা ট্রামের ভাড়াটা ছাড়া। রাস্তায় চটি ছিড়লে সারানোর পয়সা পর্যন্ত থাকে না পকেটে। কী সাংঘাতিক! বাড়তি পয়সা থাকলেই খরচ হওয়ার ভয়। পৌষপার্বণের দিন পিঠে তৈরি হয় বলে এ বাড়িতে সেদিন রান্না বন্ধ। সবাই পিঠে খেয়ে থাকে। আমার বাবার বাড়িওয়ালা বাবাকে হরতালের আগের দিন দু'বার বাজার করতে দেখে খেপে গিয়েছিলেন। এদের দেখলেই সেই বুড়ো বাড়িওলা ভারী খুশি হতেন।

এত চেঁচামেচির মধ্যে মাসির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। পাওয়ার কথাও নয়। আমার বোকাসোকা, ভালমানুষ কানা মাসি সবসময়ে তার আশপাশের লোকজনকে বড় বেশি চালাক-চতুর বলে মনে করে। কী জানি বাবা, আমি যখনই কথা কই তখনই

কেমন বোকা-বোকা কথা বেরিয়ে পড়ে প্রায়ই এই বলে দুঃখ করত মাসি। এ বাড়িতে আসা ইস্তক বোকা কথা বলে ফেলার ভয়ে মাসির বাক্য প্রায় হরে গেছে। যাও-বা বলে তাও ফিসফিসের মতো আস্তে করে। এ বাড়ির ঝি-চাকরকেও খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে মাসি। কোনও ঝগড়া কাজিয়া চেঁচামেচির মধ্যে নাক গলায় না। কর্তা যা বোঝায় তা-ও বোঝে, আবার গিন্নি যা বোঝায় তা-ও বোঝে। যা কিছু বলার কথা থাকে তা আমাকে বলার জন্য পেটে জমিয়ে রাখে মাসি।

বকাবকি এখনও শেষ হয়নি। ভিতর-বাড়ির দিক থেকে একটা গদি-আঁটা মোড়া এক হাতে, অন্য হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বড়গিন্নি উঠে আসছিলেন বকতে বকতে, মতিচ্ছন্ন, মতিচ্ছন্ন! বাজারে যাওয়ার সময়ে পই পই করে বললুম মাছের কথা, কান দিয়ে শুনল।

কলঘর থেকে বড়কর্তা বললেন, মাছ কান দিয়ে মাথায় ঢুকেই ডিম হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বের করে দাও আজই জুতোপটা করে।

মাসির কাছে যাতায়াত করতে করতে আমি এ বাড়ির পুরনো লোক হয়ে গেছি। তাই বড়গিন্নি আমাকে দেখে লজ্জা পেলেন না, খবরের কাগজ ধরা হাতে ঘোমটাটা একটু টেনে বললেন, ডিম নিয়ে কী কাণ্ড শুনছ তো! আমার ছেলেরা সব ওইরকম। যাও, ঠাকুরঝি রান্নাঘরে আছে।

মাসি রান্নাঘরেই চৌপর দিন পড়ে থাকে, আমি জানি। ইচ্ছে করেই থাকে। রান্নাঘরের বাইরের দুনিয়াটায় মাসির বড় অস্বস্তি।

মাসি আলু কুচিয়ে নুন মাখা শেষ করেছে, কড়াইতে তেল হয়ে এল। ছাড়ার আগে তেলের ফেনার শেষ বুদবুদটার মিলিয়ে যাওয়া একটা চোখে সাবধানে দেখছিল। মুঠোয় ধরা জল নিংড়ানো ঝিরিঝিরি করে কুচোনো আলু! আজ মাছের বদলে বড়বাবু এই আলুভাজা খেয়েই যাবে।

মাসি বলে ডাকতেই মাসি ঠান্ডা সুস্থির মুখখানা বোল! কানা চোখটার কোলে জল জমে আছে। একগুচ্ছ উঁচু নোংরা দাত ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে থাকে সবসময়ে, ওই দাঁতগুলোর জন্য কখনও দুই ঠোঁট এক হয় না। দু'গালের হনু জেগে আছে। ময়লা থানের ঘোমটায় আধো-ঢাকা মাথায় অনেকগুলো পাকাচুল ভেসে আছে। মাসি দেখতে একদম ভাল না। দাঁতগুলোর জন্যই আরও কুচ্ছিত দেখায়। বাবার দু'-একজন শুভানুধ্যায়ি বা বন্ধুবান্ধব বাবাকে বলত, বাপু হে, দ্বিতীয় বিয়েটা আর-একটু দেখেশুনে করলে পারতে! বাবা জবাব দিত, না হে, বউ সুন্দর-টুন্দর হলে আমি হয়তো বা বউ-খ্যাপা হয়ে যেতাম, তা হলে আমার উপলের কী হত! উপলকে মানুষ করার জন্যই তো দ্বিতীয় বিয়েতে বসা।

কানা মাসি সুন্দর নয় বলে আমার তো কিছু খারাপ লাগে না।

তেল থেকে ধোঁয়া উঠতে, মাসি কুচোনো আলু ছাড়তে ভুলে গিয়ে দু'গাল ভরতি করে

হেসে বলল, দিনরাত ভাবছি। ও উপল, দু'বেলা ভরপেট খাস তো।

খাই। আমার খাওয়ার চিন্তা কী?

পিঁড়ি পেতে বোস।

বসলাম। বললাম, মাসি তেল পুড়ে যাচ্ছে, আলু ছাড়ো।

তেলে পড়ে আলু চিড়বিড়িয়ে উঠল। মাসি এক চোখের দৃষ্টিতে গোরু যেমন বাছুরকে চাটে তেমনি চেটে নিল আমাকে। বলল, একটা মাত্র চোখ, তা সে চোখে ছানি আসছে।

উদাস হয়ে বললাম, আসবেই। বয়স হচ্ছে।

কলঘর থেকে বড়বাবু মাটি কাঁপিয়ে বেরোলেন। শব্দ হল। মাছের শোক এখনও ভুলতে পারেননি, চেঁচাচ্ছেন সমানে, বললুম তো, বিড়ি-টিড়ি খেতে শিখেছে, খোঁজ নিয়ে দেখোগে যাও। কত করে ডিমের জোড়া এনেছে বলল?

বলতে বলতে বড়বাবু পুরনো সিঁড়িতে ভূমিকম্প তুলে ওপরতলায় উঠে গেলেন।

মাসি একটা সোনার মতো রঙের ঝকঝক করে মাজা কাঁসার থালায় ভাত বাড়তে লাগল। এমন যত্নে ভাত বাড়তে বহুকাল কাউকে দেখিনি। নিখুঁত একটা নৈবেদ্যের মতো সাজানো ভাতের ঢিবি, একটা ভাতও আলগা হয়ে পড়ল না। ঢিবিটার ওপর ছোট একটা মধুপর্কের মতো বাটিতে একরত্তি ঘি। নুনটুকু পর্যন্ত কত যত্নে পাতের পাশটিতে সাজিয়ে দিল। দেখলে খেতে ইচ্ছে করে।

মাসি বলল, আজ মাছ নেই বলে ঘিয়ের ব্যবস্থা, নইলে ঘি রোজ দেওয়ার কথা নয়। গোবিন্দটা বড্ড বকুনি খেল আজ।

মাসির রান্নার কোনও তুলনা হয় না। আমাদের মতো গরিব-গুর্বোর বাড়িতে কীই বা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল! তবু মাসি জলকে তেল বলে চালিয়ে, কি কাঠখোলায় ভাজা সম্বর দিয়ে এমন সব রান্না করত যে আমরা পাত চেটেপুটে উঠতাম। সেই রান্নার ধাঁচ আজও আছে। মাসি একটু নিরামিষ বাটিচচ্চড়ি যখন বড়বাবুর পাতে সাজিয়ে দিচ্ছিল তখন পুরনো আভিজাত্যের গন্ধ নাকে ঠেকল এসে।

বললাম, মাসি, তোমাকে এরা খেতে-টেতে দেয়?

মাসি চাপা গলায় বলল, এ সব অত জোরে বলিস না। কে শুনতে পাবে।

বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, দেয়। আবার একটু চুপ করে আলু ভাজা ওলটাল মাসি, খানিক নেড়ে চেড়ে তেল থেকে হলুদ, মুড়মুড়ে ভাজা ছেঁকে তুলে বড়বাবুর পাতের বাহার বাড়িয়ে বলল, তোকে দেয়?

দেবে না কেন? তা ছাড়া পুরুষ ছেলের আবার খাওয়ার ভাবনা। তোমার খাটুনি কেমন?

মাসি রেখে-ঢেকে বলল, সে আর বেশি কী? দু'বেলা মোটে তো রান্না। চোখটাই আজকাল বড় অসুবিধে করে। সকালে কী খেয়েছিস?

চা আর বিস্কুট। তুমি?

বড় অফিস গেলে এইবার খাব। বোস। তোর জন্য একটা জিনিস রেখেছি। কতকাল আসিস না বল তো! মাঝরাতে উঠে বুক কেমন করে। কাঁদি কত।

ওপর থেকে বড়গিন্নি ডাক দিল, ঠাকুরঝি ভাত দিয়ে যাও।

মাসি এক হাতে থালা, অন্য হাতে ডালের বাটি নিয়ে উঠে গেল। ফাঁকা রান্নাঘরে বসে নিজেকে খুব খারাপ লাগল। আমার কত কিছু হওয়ার কথা ছিল! তার একটা কিছু হলে মাসি কি এ বাড়িতে রেঁধে খায়? একটু বাদে মাসি ফিরে এসে বলল, ওদের ফাইফরমাশ খাটিস নাকি?

খাটি।

খাটিস। না খাটলে ভালমতো খেতে দেবে না। বড়কে বলে রেখেছি ওর অফিসে তোকে একটা কাজ দিতে।

বড়বাবু আমাকে দেবে কেন? তার বড় ছেলেকে ঢোকাবে বরং।

তোকেও দেবে। বি কম পাশ চাট্টিখানি কথা নাকি! বড়র একটা ছেলেরও অত বিদ্যা আছে? তা ছাড়া তুই কত কী জানিস! গান, আঁকা, পাট করা।

মাসি পুরনো একটা কৌটো খুলে দু'-তিনটে পাউরুটির টুকরো বের করে আমাকে দিয়ে বলল,খা।

মাসির এই এক রোগ, কোনও কিছু ফেলবে না। আমাদের বাড়িতে লাউ বা আলুর খোসা পর্যন্ত ফেলত না, চচ্চড়ি বা ভাজা করে ফেলত। এমনকী পেঁপের খোসা পর্যন্ত রসুন-টসুন দিয়ে বেটে ঠিক একটা ব্যঞ্জন তৈরি করে ফেলত।

পাউরুটির টুকরোগুলো বিস্কুটের মতো। কটকটে শক্ত।

উনুনের ধারে রেখে রেখে করেছি। ভাল না?

ভালই। খেতে খেতে বলি, পয়সাকড়ি দেয় কিছু?

না। পয়সা দিয়ে হবেই বা কী? এক মাঝে মাঝে তোকে একটু জামা-টামা দিতে ইচ্ছে

করে। কেমন এক ছোঁটলোকি পোশাক পরে বেড়াস। গোবিন্দর কেমন সব জামাকাপড়। কিন্তু কাজ-টাজ হয় না কেন তোর বল তো! তা হলে তোর কাছে থেকে দু'বেলা দুটো রেঁধে খাওয়াতাম।

ক্ষণার দেওয়া বাজারের পয়সা থেকে বা সারা বাড়ি আঁতিপাঁতি খুঁজে যা পয়সাকড়ি জমিয়েছি তা সবসুদ্ধ গোটা ত্রিশ টাকা হয়েছে। সেগুলো আনার সময় পাইনি আজ। সুবিনয়ের দেওয়া পাঁচটা টাকার যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে দুটি টাকা পকেট থেকে বের করে মাসিকে দিয়ে বলি, রেখে দাও। কিছু খেতে-টেতে ইচ্ছে করলে কিনে খেয়ো।

কানা চোখে জল পড়ছিলই, এবার ভাল চোখ দিয়েও গড়াতে লাগল।

ঠাকুরঝি, ভাত আনো। বড়গিন্নি সিঁড়ির ওপর থেকে বলে।

যাই।—বলে মাসি বাটি-টাটি নিয়ে উঠে গেল।

রান্নাঘরটা ঝকঝক করছে পরিষ্কার। কোথাও একটু ঝুল কালি নেই, মেঝেয় গুচ্ছের জল পড়ে নেই, খাবার আটকা অবস্থায় রাখা নয়। মাসি এ সব কাজে পি-এইচ ডি।

মাসি খবরের কাগজে মোড়া একটা মুগার থান হাতে ফিরে এসে বলল, এটা দিয়ে দুটো জামা করিয়ে নিস।

হাতে নিয়ে দেখি, পুরনো হলেও আসল মুগার জিনিস। এখানে সেখানে কয়েকটা ছোপ ছোপ জলের দাগ বাদ দিলে এখনও ঝকমক করছে। বললাম, কোথায় পেলে?

বড়র মা মরে গেল তা বছর দুই হবে। তার সব বাক্স-প্যাটরা ঘেঁটে এই সেদিন পুরনো কাপড়-চোপড় যা বেরিয়েছিল তার থেকে বড়গিন্নি এইটে আমাকে দিয়েছে। তখনই ভেবে রেখেছি, তুই এলে জামা করতে দেব। ভাল দরজিকে দিয়ে বানাস। ভাল না জিনিসটা?

হুঁ।

কেতকীর সঙ্গে খুব ঝগড়া হচ্ছে বাড়ির সবার।

কেন?

কেন আর! মেয়েটা বড় ভাল, কিন্তু ওকে ছোঁড়ারা বড় যন্ত্রণা করে। ওর দোষ কী?

আমি চুপ করে থাকি। কেতকীর ব্যাপারে মাসির একটা দুরাশা আছে। মাসি চায়, কেতকীর সঙ্গে আমার বিয়ে হোক।

বললাম, মাসি, কেতকীকে নিয়ে অত ভেবো না। তাকে নিয়ে ভাববার অনেক লোক আছে।

মাসি দমের আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়াচ্ছিল। বলল, কাকে নিয়ে না-ভেবে পারি বল। আপনা থেকেই সব ভাবনা আসে। এই যে গোবিন্দটা আজ বকুনি খেল সেই বসে বসে সারা দিনমান ভাবব। বড্ড গোবেচারা ছেলে। ডিমের নামে পাগল। কত দিন লুকিয়ে-চুরিয়ে আনে, বলে, ভেজে দাও। আমিও দিই।

মনটা একটু খচখচ করে। একদিন ছিল, যখন মাসির গোটা বুকখানা জুড়ে আমিই ছিলাম। এখন আবার সেই জায়গায় অন্য লোকজন একটু-আধটু ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ছে। দোষ নেই, আমি মাসির বল্গাছাড়া ছেলে, এক বুক মায়া নিয়ে মাসিরই বা একা পড়ে থাকতে কেমন লাগে। মায়া এমনিই, থাকতে থাকতে দেখতে দেখতে একজন না একজনের ওপর পড়ে যায়।

বললাম, কেতকীকে নিয়ে তুমি আর ভেবো না মাসি, আমার গতিক তো দেখছ।

মাসি একটা চোখে ছানি সত্ত্বেও বেশ খর করে তাকিয়ে বলল, হালগতিক খারাপটা কী? বরাবরই তুই একটু কুঁড়ে বলে, নইলে তোরটা খেয়ে লোকে ফুরোতে পারত না। মা যেমন ছেলে চেনে তেমন আর কে চিনবে রে? ও সব বলিস না। বোস একটু, দমটা কষাই, দু'খানা রুটি দিয়ে খেয়ে যা। না কি ভাত খাবি দুটো?

না, না। ঝামেলায় যেয়ো না। পাঁচটা কথা উঠে পড়তে পারে।

মাসি একটা মাত্র ছানিপড়া চোখ সার্চলাইটের মতো আমার ওপর ফেলল। স্টিমারের বাতি যেমন তীরভূমির অন্ধকার থেকে খানাখন্দ, গাছপালা ভাসিয়ে তোলে, মাসির চোখ তেমনি আমার ভিতরকার খিদে-টিদে, জ্বালা-যন্ত্রণা সব দেখে নিল।

বেশি কথার মানুষ নয়, আলুর দম চাপিয়ে ঝকঝকে একটা কাঁসার থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, লোকে তোকে সোনা হেন মুখ করে খেতে দেবে, তেমন কপাল করেছিস নাকি? যে বাড়িতে থাকিস তাবাও না জানি কত গালমন্দ শাপ-শাপান্ত করে তবে খেতে দেয়।

আমার খিদেটা কোনও সময়েই তেমন তৃপ্তি করে মেটে না। খুব তৃপ্তি করে খেলে পেটে যে একটা চমৎকার যুদ্ধবিরতির অনুভূতি হয়, তা আজকাল টের পাই না। সব সময়েই একটা খিদের ভাব থাকে, সেটা কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কয়েক দিন আগে এক বিকেলে ক্ষণা সবাইকে আনারস কেটে দিয়েছিল। আমাকে কিছু কম, অন্যদের কিছু বেশি। সুবিনয় আনারস চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলছিল। দেখলাম, ক্ষণাও ছিবড়ে ফেলে, সুবিনয়ের মাও। কিন্তু আমার আর ছিবড়ে হয় না। যত বার মুখে দিয়ে চিবোই, তত বার শেষ পর্যন্ত গিলে ফেলি। পাছে ওরা লোভী ভাবে, সেই ভয়ে একবার-দু'বার অতি কষ্টে একটু-আধটু ছিবড়ে ফেলেছি বটে, কিন্তু আগাগোড়া ছিবড়ে ফেলার ব্যাপারটাকেই আমার খুব অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। আমার তো আজকাল আখ খেলেও ছিবড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে না।

মাসি ভাতের থালাটা রান্নাঘরের কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, খেতে থাক। দমটা

হয়ে এল, ঘি গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে ফেলব এবার। পেট ভরে খা, ভয়ের কিছু নেই।

পেট ভরে খা এই কথাটা বহুকাল কেউ বলেনি আমাকে। আমার দুনিয়া থেকে কথাটা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে। তাই ভাবি, শুধু এক থালা ভাতের জন্য নয়, ওই কথাটুকু শুনবার জন্যই বুঝি মাসির কাছে মাঝে মাঝে এই আসা আমার।

ভাতের থালাটা নিয়ে আবডালে সরে বসে খেতে খেতে বলি, মাসি, এর জন্য তোমাকে না আবার কথা শুনতে হয়।

মাসি আলুর দমের ঢাকনা খুলে চার দিক গন্ধে লন্ডভন্ড করে দিয়ে বলল, অত কিটির কিটির করিস না তো বাপঠাকুর। সারাদিন এ বাড়ির জন্য গতরপাত করছি, তাও যদি আমার ছেলে এখান থেকে শুধু মুখে ফিরে যায় তো এর চেয়ে ফুটপাথে গিয়ে থাকা ভাল।

মাসির এই তেজ দেখে অবাক হই। আগে মাসির এত তেজ ছিল না। এ বাড়িতে বেগার খেটে খেটে কি মাসির একটা মরিয়া ভাব এসেছে নাকি!

জানালার শিকের ফাঁকে একটা বেড়াল লাফ দিয়ে উঠে এসে পরিষ্কার গলায় ডাকল, মা।

মাসি তার দিকে চেয়ে বলল, সারাটা সকাল কোন মুলুকে ছিলে? এখন হাত জোড়া, বসে থাকো ওইখানে। খাবেই বা কী, আজ মাছ-টাছের বালাই নেই।

জানালার বাইরে একটা কাক হুতুম করে এসে বসল, একটা চোখে মাসিকে দেখে খুব মেজাজে বলল, খা?

মাসি তাকেও বলল, মুখপোড়া কোথাকার! যখন-তখন তোমাদের আসবার সময় হয়! যা, এখন ঘুরে-টুরে আয়।

বলতে বলতে মাসি বেড়ালকে এক খাবলা দুধে-ভাতে মেখে দিল, জানালার বাইরে কাকটাকে দু’ টুকরো বাসি রুটি দিয়ে বিদেয় করল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম, এইসব কাক বেড়াল সেই আমাদেরগুলোই নাকি! মাসির গন্ধে গন্ধে এসে এখানেও জুটেছে।

বললাম, মাসি, সারাটা জীবন তোমার পুষ্যিরা আর তোমাকে ছাড়ল না। কাক, কুকুর, বেড়াল, আমি।

মাসি বলল, মুখ্যু।

কে?

তুই।

এই যে বলে বেড়াও, আমি বি কম পাশ করা মস্ত লায়েক!

তা হলেও মুখ্যু। যে নিজেকে কাক কুকুরের সমান ভাবে, সে মুখ্যু ছাড়া কী?

তাই তো হয়ে যাচ্ছি মাসি দিনকে দিন।

বালাই ষাট। একদিন দেখিস, তোরটা কত লোকে খাবে।

আলুর দম দিয়ে মাখা ভাত মুখে দিয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গেল। আমি কোথায় আছি, আমি কে, এ সব জরুরি ব্যাপার পর্যন্ত মনে পড়ছে না। পেটের ভিতর এক অপরিসীম প্রশান্তি নেমে যাচ্ছে। মনে হয়, আমার হৃদয়ের কোনও সমস্যা নেই, মস্তিষ্কের কোনও চাহিদা নেই, আমার কেবল আছে এক অসম্ভব খিদে।

সেই মুহ্যমান অবস্থা থেকে যখন বাস্তবতায় জেগে উঠি, পৃথিবীটা তখন নতুন রকম লাগে। একটা কুয়াশার মতো আবছায়ার ভিতর থেকে রান্নাঘরটা যখন আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল তখন দেখি, দরজার চৌখুপিতে সাংঘাতিক ঝলমলে রঙে একটা মেয়ের ছবি কে এঁকে রেখেছে। অবাক হয়ে মেয়েটা আমাকে দেখছে। আমিও অবাক হয়ে তাকে দেখি।

মেয়েটা বলল, উপলদা না?

কেতকীকে দেখে মনে হল, সে খুব হালে খোলস ছেড়েছে। কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে তাকে। রোগা, বিষন্ন। সেই ভালবাসার চোখও যেন আর নেই।

লজ্জা পেয়ে বলি, এই দেখোনা, মাসি জোর করে খাওয়াল।

কেতকী একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আপনার খুব খিদে পেয়েছিল। এমনভাবে খাচ্ছিলেন।

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো বলি, হ্যাঁ, আমার খুব খিদে পায়।

আমার পায় না।

এই বলে কেতকী তার স্নান করা ভেজা এলোচুল বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এনে আঙুলে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, খাওয়া জিনিসটাই এত বাজে আর বিচ্ছিরি! আমার একদম খেতে ইচ্ছে করে না। লোকে যে কী করে খায়!

মাসি জড়সড় হয়ে বসে ছিল। বেরিয়ে থাকা দাঁতের ওপর দুটো মাছি বসে একটু মারপিট করে উড়ে গেল। মাসি টের পেল না।

কেতকী পিছনে হেলে আবার তার চুলের গোছ পিঠে ফেলে দিয়ে বলল, পিসি খুব ভাল রাঁধে, কিন্তু তবু আমার খেতে ইচ্ছে করে না।

এই বলে কেতকী চলে গেল।

মাসি অকারণে বলল, বড় ভাল মেয়েটা। খাওয়া-টাওয়া খুব কম। কোনও বায়নাক্কা নেই।

আমি বললাম, হু, বেশ ভাল।

পড়াশুনোতেও খুব মাথা।

হু।

কেবল ছোঁড়াগুলো জ্বালায়, তার ও কী করবে! ও কারও দিকে ফিরেও দেখে না। তবু সেদিন বড়গিন্নি ওকে কী মার মারলে! তারপর মেয়ে তিন দিন খায়নি।

অবাক হয়ে বলি, অত বড় মেয়েকে মারল কী গো?

তাও কী মার বাবা! একবার ছড়ি দিয়ে, একবার জুতো দিয়ে, শেষমেষ মেঝেয় মাথা ঠুকে ঠুকে উত্তম কুস্তম মার। সে মার দেখে আমার বুকে ধড়াস ধড়াস শব্দ আর শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল।

হয়েছিল কী?

ওই গলির মোড়ের লাল বাড়িটায় একটা গুন্ডা ছেলে থাকে। তার বড় বাড় হয়েছে। রাস্তায়-ঘাটে যখন তখন কেতকীকে জ্বালাতন করে। তার সঙ্গে আবার ছোটকর্তার সাট আছে। কাকা হয়ে ভাইঝিকে হেনস্থা করার যে কী রুচি বাবা। সেই ছোটকর্তার লাই পেয়ে ছোঁড়াটার আরও সাহস বেড়েছে। এই তো সেদিন কেতকী কলেজ থেকে ফিরছে সন্ধেবেলা। ছোঁড়াটা মোড়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, কেতকী যেই এসেছে অমনি দু-তিনজন মিলে তাকে ধরেছে ট্যাক্সিতে তুলবে বলে। চেঁচামেচি, রই-রই কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনি ভাগ্যে! সেইজন্য নির্দোষ মেয়েটাকে ধরে এই মার কি সেই মার।

পুলিশে ধরিয়ে দিল না কেন ছেলেটাকে?

কে দেবে বাবা! সে ছেলের ভয়ে নাকি সবাই থরহরি। বড়কর্তা খানিক চেঁচামেচি করল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তারপর সব চুপচাপ। মার খেয়ে কেতকী আমাকে ধরে সে কী কান্না। কেবল বলে, বাবাকে বলো আমার বিয়ে দিয়ে দিক, আমি আর এ সব যন্ত্রণা সইতে পারছি না।

উৎসুক হয়ে বলি, কাকে বিয়ে করতে চায় কিছু বলল।

না, তোর যদি একটা কিছু হত, একটু যদি মানুষের মতো হতি! বড় ভাল ছিল মেয়েটা। একদিন ঠিক ষণ্ডাগুণ্ডায় টেনে নিয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ি।

.

০৭.

সুবিনয়ের সঙ্গে যদি কখনও আমার কোনও শলাপরামর্শ থাকে তবে আমরা সাধারণত সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটবাড়িতে দেখা করি। কোম্পানির লিজ নেওয়া বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ি। চারখানা মস্ত শোওয়ার ঘর, একটা বসবার, একটা খাওয়ার আর একটা পড়াশুনো করবার ঘরও আছে, তিনটে বাথরুম, গ্যাস লাইনের ব্যবস্থাসহ রান্নাঘর, টেলিফোন-কী নেই? এত ভাল বাসা ছেড়ে সুবিনয় বোকার মতো তার প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোডের পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছে। কোম্পানির দেওয়া এ বাসার খবর তার বাড়ির কেউ জানেও না।

বাইরের ঘরে সোফায় বসে মস্ত লম্বা দুটো ঠ্যাং সামনে ছড়িয়ে প্রায় চিতপাত অবস্থায় শুয়ে সুবিনয় আমার কাছ থেকে সব শুনল। একমনে সিগারেট খাচ্ছিল কেবল, কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু আমার কথা শেষ হতেই একটা ঝাঁকি মেরে উঠে বসল। তার পরনে কেবলমাত্র একটা আন্ডারওয়্যার আর স্যান্ডো গেঞ্জি। উঠে বসতেই তার শরীরের সব সহজাত মাংসপেশিগুলো টনটনে হয়ে উঠল। দুটো চোখে আলপিনের ডগার মতো সরু এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ভ্রূ কোঁচকানো। দশাসই বিশাল চেহারাটায় একটা উগ্র রাগ ডিনামাইটের মতো অপেক্ষা করছে।

বলল, তুই তো এর আগেও কত বার প্রীতিকে আমার চিঠি দিয়ে এসেছিস, কোনওবার এমন কথা বলেছে?

না।

তবে আজ বলল কেন? ঠিক কীভাবে বলল হুবহু দেখা তো! ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছে নাকি?

না, ঠাট্টা নয়। খুব সিরিয়াস।

ঠিক আছে, সে আমি বুঝব। তুই দেখা তো।

বহুকাল বাদে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আমি রুমার দরজা খোলা থেকে শুরু করেছিলাম। রুমা দরজা খুলে খুব অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কী খবর?

সুবিনয় বলল, আঃ, প্রীতিরটা দেখা না।

আমি একটু আহত হই মনে মনে। তারপর প্রীতির কথাবার্তা হাবভাব দেখাতে থাকি। তার ‘বেচারা’ বলার তিন রকম নিখুঁতভাবে অভিনয় করলাম। চিঠি ছিঁড়ে ফেলার ভঙ্গিটাও চমৎকার হল।

কিন্তু অত দেখল না সুবিনয়। বেরসিকের মতো অভিনয়ের মাঝখানে উঠে গিয়ে খোলা জানালার ধারে দাঁড়াল। স্যান্ডো গেঞ্জি আর মাত্র আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় খোলা জানালায় দাঁড়ানো কতটা বিপজ্জনক তা ভেবে দেখবার মতো স্থিরবুদ্ধি ওর এখন আর নেই। জানালা থেকেই মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত গমগমে বিকট গলায় আমাকে বলল, প্রীতি তোকে মিথ্যে কথা বলেছে, তা জানিস? ম্যাসাচুসেটসে ও আমাকে বারবার উত্ত্যক্ত করত, বিয়ে করার কথা বলত। ওর কয়েকটা চিঠিতেও ছিল সে সব কথা, দেশে ফিরে আমাদের বিয়ে হবে। কিন্তু চিঠিগুলো...

আমি প্রায় নিঃশব্দে বললাম, আমার কাছে আছে।

আছে?– সুবিনয় গর্জে ওঠে।

ভয় খেয়ে বলি, আছে বোধহয়। তবে?

বলে বুনো মোষের মতো ঘরের মাঝখান অবধি তেড়ে এল সুবিনয়, সিলিং-ছোঁয়া বিকট দানবীয় চেহারাটা ধক ধক করছে রাগে। আবার বলল, তবে?

আমি খুব সংযত গলায় বললাম, সুবিনয়, ছেড়ে দে না। তোর তো ক্ষণা আছেই। আবার কেন হাঙ্গামায় জড়াবি?

সুবিনয় হঠাৎ অট্টহাসি হাসল। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, পৃথিবীতে কোনও জিনিয়াস কখনও একটামাত্র মেয়েমানুষ নিয়ে থাকতে পারে না। দে নিড গার্লস এ লট অব গার্লস। বুঝলি? এক সময়ে গ্রিক ফিলজফাররা রক্ষিতাদের বাড়িতে বা বেশ্যাপাড়ায় বসে শাস্ত্রের আলোচনা করত।

মিনমিন করে বললাম, প্রীতি যখন চাইছে না তখন ছেড়ে দে।

ডোন্ট টক লাইক এ ফুল।

ভয় পাই, তবু বলি, ক্ষণাকে কেন ডিভোর্স করবি? ও তো কোনও অন্যায় করেনি!

সুবিনয় গর্জে ওঠে ফের, অন্যায় করেনি তো কী? ওকে নিয়েই আমাকে থাকতে হবে এমন কোনও কথা আছে? যা তো, দুনিয়ার সব বিবাহিত পুরুষমানুষকে জিজ্ঞেস করে আয়, তাদের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট তাদের একজিস্টিং ওয়াইফকে ছেড়ে নতুন কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চায় কি না! যদি না চায় তো আমি কান কেটে কুত্তার গলায় ঝোলাব।

মরিয়া হয়ে বললাম, প্রীতির একজন আছে, বললাম তো। সেও বাগড়া দেবে।

সুবিনয় সোজা এসে আমার কলারটা চেপে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বাগড়া দেবে! বাগড়া দেবে! উইল হি লিভ আপ টু দেন?

সামান্যই ঝাঁকুনি, কিন্তু সুবিনয়ের আসুরিক শক্তির দুটো নাড়া খেয়েই আমার দম বেরিয়ে গেল। একটা মানুষের শারীরিক শক্তি যে কী প্রবল হতে পারে তা সেই ঝাঁকুনিতে টের পেলাম। যদি প্রীতির সেই ছেলে বন্ধুর সঙ্গে সুবিনয়ের বাস্তবিকই কোনও শো-ডাউন হয় তো আমি নির্দ্বিধায় সুবিনয়ের দিকেই বাজি ধরব।

সুবিনয় আমাকে ছেড়ে দিয়ে ফের সোফায় চিতপাত হয়ে বসল। সিগারেট ধরিয়ে ছাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, উপল, আই ওয়ান্ট দ্যাট চ্যাপ ফেস টু ফেস।

আমি মৃদু স্বরে বললাম, ছেলেটার দোষ কী? ও কি তোর সঙ্গে প্রীতির অ্যাফেয়ার জানে?

তা হলেও, আমি ওকে একবার হাতে পেতে চাই। প্রীতির চোখের সামনে আমি ওকে গুড়ো করে ফেলব।

সকালবেলায় পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা যে অন্যমনস্ক লম্বা, ভদ্র বৈজ্ঞানিককে রাস্তার লোকেরা হেঁটে যেতে দেখেছে সে আর এই সুবিনয় এক নয়। আন্ডারওয়্যার আর গেঞ্জি পরা এ এক অতি বিপজ্জনক প্রেমিক।

পৃথিবীর ওপরকার জামা তুলে তার শরীরের লুকোনো দাদ চুলকুনি আমি দেখতে চাই না। তবু আমার জীবন আমাকে তা দেখাবেই।

আমি বললাম, তুই কী চাস?

সুবিনয় একটা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, এ শো-ডাউন। ভেরি প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড এফেকটিভ শো-ডাউন।

তুই মারধর করবি?

মারধরের চেয়ে দুনিয়াতে আর কোনও কুইক এফেকটিভ জিনিস নেই।

সুবিনয়!

কী?

ভেবে দ্যাখ।

দুর্বলরা ভাবে, শক্তিমানরা কাজে নামে। টেকনিকাল কাজের বাইরে আমি খুব একটা ভাবনা-চিন্তা করার লোক নই। প্রীতিকে আমার চাই, অ্যাট এনি কস্ট।

সেই ছেলেটাকে যদি মারিস তা হলে পুলিশ কেসে পড়ে যেতে হবে, মামলা মোকদ্দমায় গড়াবে। কে জানে, ছেলেটার হয়তো ভাল কানেকশনসও আছে, যদি থাকে তো তোর ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুবিনয় মাথা তুলে তাকাল। মুখের এক পাশে হলুদ আলো পড়েছে, অন্য পাশটা অন্ধকার। মেদহীন মুখের খানাখন্দে আলো-আঁধারের ধারালো রেখা। চোখ স্থির। যে-কেউ দেখলে ভয়ে হিম হয়ে যাবে।

সুবিনয় বলল, ডু আই কেয়ার?

সুবিনয় উঠে জামা-প্যান্ট পরতে লাগল। আপনমনে কেবল বলল, আমি সহজ সরল সম্পর্ক বিশ্বাস করি। জটিলতা আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

আশ্চর্য এই যে, আমি নিজেও জটিলতা পছন্দ করি না। পৃথিবীটা আমার কাছে খুবই সাদামাটা। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, মানুষ বিষয়কর্মে যায়, ছানাপোনা নিয়ে ঘর করে, শীতের পর আজও বসন্ত আসে, ঘড়ির কাঁটা ধরে আমার খিদে পায়। আমার সমস্যা একটাই, বড় খিদে পায়। কখনও নিশ্চিতভাবে খিদে মেটে না। মিটলেও, আবার খিদে পাবে বলে একটা দুশ্চিন্তা থাকে। এ ছাড়া আমার জীবন সহজ সরল। প্রীতি নেই, ক্ষণা নেই, প্রীতির প্রেমিক নেই। কেবল খিদে আছে, খিদের দুশ্চিন্তা আছে।

দিন দুই পর কালো চশমা আর নকল দাড়ি-গোঁফওলা একটা লোককে খুবই অসহায়ভাবে গোলপার্কের কাছে যোরাঘুরি করতে দেখা গেল। সকাল কি সন্ধেবেলা লোকটা রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে, দাঁড়ায়, উপানে তাকিয়ে কী যেন দেখে, বাতাস শোকে। এতই পলকা তার ছদ্মবেশ যে এক নজরেই ছদ্মবেশ বলে চেনা যায়। তার হাবভাবে এত বেশি আত্মবিশ্বাসের অভাব যে, যে-কোনও সময়ে সে রাস্তার লোকের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, লোকটা প্রীতিদের ফ্ল্যাটবাড়ির নীচের তলার সদর দরজার কাছে নিচু হয়ে কী খোঁজে, কিংবা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আকাশের চিল দেখে, কিংবা উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খায়। আমি ঠিক জানি, সেই সময়ে লোকটাকে কেউ নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞেস করলে লোকটা অবশ্যই বোকার মতো একটা ভোঁ-দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, কিংবা হয়তো ভ্যা করে কেঁদে ফেলত ভয়ে। রুমা মজুমদার একদিন বিকেলে বাসায় ফেরার সময়ে লোকটাকে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে রুমাল দিয়ে নিজের জুতো মুছতে দেখে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিল। লোকটা অতি কষ্টে একটা করোনারি অ্যাটাক থেকে বেঁচে যায় সে বার। তিন-চার দিন লোকটা ওইভাবে ঘোরাঘুরি করল এলাকাটায়। নজর রাখল। নকল দাড়ির নীচে বড্ড চুলকুনি হয়, নকল গোঁফের ক্লিপ বড্ড জোরে এঁটে বসে নাকের লতিতে। কালো চশমার অনভ্যাসে চোখ ভেপে ওঠে। এইসব অস্বস্তি নিয়েও লোকটা লেগে রইল একটানা। প্রীতিকে সে রোজই দেখতে পেল, কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে। প্রীতির প্রেমিকও রোজ সকালে একবার আসে, বিকেলে আর একবার। বিকেলে প্রেমিকটি নিজের একটি জেফির গাড়ি নিয়ে আসে, প্রীতিকে নিয়ে বেড়াতে যায় কোথায় কে জানে! রাত আটটা নাগাদ ওই একই গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সকালের দিকে আসে একটা লাল রঙা স্পোর্টসকারে। কখনও-সখনও সেই গাড়িতেই প্রীতি কলেজে যায়, যেদিন ক্লাস থাকে

আগেভাগে। নইলে খালি গাড়ি নিয়ে প্রেমিকটি ফিরে যায়। লোকটা আরও খবর নিল, রুমা যদিও এখন আর ভলিবল খেলে না, তবু রোজ সন্ধের দিকে খানিকক্ষণ লেকে সাঁতরায়। কিংবা ওয়াই এম সি এ-তে গিয়ে টেবিল টেনিস খেলে। সন্ধের দিকে রুমা কখনওই বাসায় থাকে না। লোকটা আরও ধৈর্য ধরে দেখে দেখে জানল যে, প্রীতিদের বাসার নীচের তলায় দুটো ফ্ল্যাটের একটায় কয়েকজন মাদ্রাজি ছেলে মেস করে থাকে, তারা খুব নিরীহ। অন্য ফ্ল্যাটটায় এক স্বামী-স্ত্রী থাকে মাত্র। ওই স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়া হয় রোজ, আবার সিনেমায় যাওয়ারও বাতিক আছে। মাদ্রাজি ছেলেরা প্রায় রাতেই বাইরে থেকে খেয়ে ফেরে বলে সন্ধেবেলা তাদের ফ্ল্যাটটাও খালি থাকে। ওপরতলায় অন্য ফ্ল্যাটটা সদ্য খালি হয়েছে, সামনের মাসে হয়তো ভাড়াটে আসবে। লোকটি যখন এইসব খবর নিচ্ছিল তখন তার ছেলেমানুষি ছদ্মবেশ এবং আত্ম-অবিশ্বাসী হাবভাব সত্ত্বেও সে ধরা পড়েনি। তবে এক দিন একটা মফস্সলের লোক আচমকা তাকে গড়িয়াহাটা কোন দিকে জিজ্ঞেস করায় সে আঁতকে উঠে জবাব না দিয়ে হুড়মুড় করে হাঁটতে শুরু করেছিল। আর একদিন দুটো ফচকে ছোকরার একজন তাকে দেখিয়ে অন্যজনকে বলেছিল, দ্যাখ ঠিক হাবুলের বাবার মতো দেখতে! তাইতে লোকটা আত্মরক্ষার জন্য কিছুক্ষণ পাগলের অভিনয় করেছিল। নিজের স্বভাববশত লোকটা এ কদিন অবসর সময়ে রাস্তায়-ঘাটে পয়সা খুঁজে বেড়াত। কত লোকের পয়সা পড়ে যায় রাস্তায়। সর্ব মোট পঁচাত্তর-পয়সা, একটা দিশি কলম, একটা আস্ত বেগুন, দুটো সিগারেট সুদ্ধু একটা সিগারেটের প্যাকেট, একটা স্টিলের চামচ, একটা মেয়েলি রুমাল আর একটা প্লাস্টিকের পুতুল কুড়িয়ে পেয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটা তার কাজে লেগেছিল আর কয়েকটা পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে সে জমিয়ে রেখেছিল।

এই নকল লোকটা আমিই। রোজ রাতে সুবিনয় তার সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করত, আমি গিয়ে তাকে সারা দিনের রিপোর্ট দিতাম। গম্ভীর হয়ে সুবিনয় শুনত, আর একটা কাগজে কখন কে বেরোয়, আর কে ঢোকে তার একটা টাইম চার্ট তৈরি করত। গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার পরা তার সুবিশাল চেহারাটা খুনির মতো দেখায় রোজ।

একদিন অনেক হিসেবের শেষে সে বলল, উপল, রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা হচ্ছে সবথেকে সেফ সময়। রুমা রোজই সাড়ে আটটায় ফেরে। প্রীতি আর তার লাভার ফেরে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মাদ্রাজি ছেলেরা ন'টার আগে কমই ফেরে, দু'-একজন আগে ফিরলেও ক্ষতি নেই।

আমি আঁতকে উঠে বলি, ক্ষতি নেই কীরে? ওরা থাকলে

সুবিনয় গম্ভীর হয়ে বলে, চার-পাঁচজনকে আমি একাই নিতে পারব। খুব বেকায়দা দেখলে তুই হেল্প করবি।

তার দরকার কী?

দরকার কে বলেছে! যদি বাই চান্স ফেরে তবেই দরকারের কথা ওঠে। বাকি থাকছে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী। এদের আচরণ আনসার্টেন। ওরা বিশেষ কোনও দিন সিনেমায় যায়

না?

না। দুদিন যায় না, তারপর যায়, আবার হয়তো তিন দিন যায় না, এইরকম আর কী!

আনওয়াইজ অফ দেম। যাকগে, অত ভাবলে চলে না।

না ভাবলেও চলবে না।

সুবিনয় আমার মুখের দিকে স্থির চেয়ে বলল, প্রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে আমেরিকায় আমি একটা ছোকরাকে ঠেঙিয়েছিলাম খোলা রাস্তার ওপর। তাতে কিছু হয়নি। অত ভাবলে চলে না।

আমি অসহায়ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

পরদিনই সুবিনয় প্রীতির ফ্ল্যাটবাড়িতে হানা দিল।

কপালটা ভালই সুবিনয়ের। সেদিন মাদ্রাজি ছেলেরা কেউ ছিল না। স্বামী-স্ত্রীও সেদিন সিনেমায় গেছে। রুমাও যথারীতি বাইরে। এবং প্রীতি আর তার প্রেমিকও সেদিন দুর্ভাগ্যবশত সাড়ে সাতটায় ফিরে এল।

সুবিনয় সিঁড়ির নীচের অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল, আমি উলটো দিকের ফুটপাথে। প্রীতি তার প্রেমিককে নিয়ে দোতলায় উঠল দেখলাম। ঠিক তার কয়েক সেকেন্ড পর সুবিনয়ের বিশাল চেহারাটা বেড়ালের মতো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পেছনে আমি।

ভেজানো দরজা ঠেলে সুবিনয় ঘরে ঢুকল। প্ল্যান মাফিক আমিও ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি আটকে পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কী ঘটছে তা দেখার সাহস আমার ছিল না। দরজার পাল্লায় পিঠ দিয়েই আমি চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। টের পাই সামনে শিক শিক, চপ, মাগো, গড, ধুপ গোছের কয়েকটা আওয়াজ হল। তারপর সব চুপচাপ।

চোখের পাতা জোর করে বন্ধ করায় ব্যথা হচ্ছিল, কানে-দেওয়া আঙুল টনটন করছে, কানের মধ্যে দপ দপ আওয়াজ হচ্ছে। বেশিক্ষণ এভাবে থাকা যায় না।

তাই অবশেষে চোখ-কান খোলা রাখতে হল।

তেমন কিছু হয়নি। ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর হয়নি, লণ্ডভণ্ডও হয়নি। প্রীতি তার ঘোরানো চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার পায়ের কাছেই পড়ে আছে প্রেমিক। প্রেমিকের চশমা একটু দূরে কার্পেটের ওপর ডানাভাঙা পাখির মতো অসহায়। সুবিনয় প্রীতির সামনে কোমরে হাত দিয়ে ওয়েস্টার্নের নায়কের মতো দাঁড়িয়ে।

পুরো একখানা বিদেশি স্টিল ছবি।

সুবিনয় ডাকল, প্রীতি, হানি, ডার্লিং!

উ! স্বপ্নের ভিতর থেকে প্রীতি জবাব দিল।

তুমি কি আমাকে ভালবাসো না?

স্বপ্নের দূর গলায় প্রীতি বলল, বাসতাম। আমেরিকায়।

সুবিনয় গর্জে উঠল, আমেরিকায়? তা হলে আমরা আবার আমেরিকায় চলে যাই চলো। সেখানে তুমি আবার আমাকে ভালবাসবে।

অনেকক্ষণ ভেবে প্রীতি ওপর নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, তাই যেতে হবে। এ দেশে থাকলে তোমাকে ভালবাসা অসম্ভব। নানা সংস্কার বাধা দেয়।

প্রীতির পড়ে-থাকা প্রেমিকের একখানা হাত সুবিনয় জুতোর ডগা দিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, এ ছেলেটা কে প্রীতি? কেমন ছেলে?

প্রীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ও একটা কাওয়ার্ড, একটা উইকলিং। এক ঘণ্টা আগেও ওকে আমি ভালবাসতাম।

এখন?– সুবিনয় গর্জন করে ওঠে।

এখন বাসি না।–প্রীতি মৃদুস্বরে বলল।

সুবিনয় কোমরে হাত রেখে টারজানের মতো হাসল। বন্য এবং সরল হাসি।

প্রীতি হাসল না। মাথা নিচু করে স্থির বসে রইল। চুলের ঘেরাটোপে মুখখানা ঢাকা।

দৃশ্যটা আমার কেন যেন বড্ড বিদেশি বলে মনে হচ্ছিল। যেন কলকাতায় নয়, নিউ ইয়র্ক বা টেক্সাসে ঘটনাটা ঘটছে। বিদেশি কোনও ছবিতে বা বইতে দৃশ্যটা কি দেখেছি বা পড়েছি? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার পেটের মধ্যে সেই স্থায়ী খিদের ভাবটা মৃদু মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

বাস্তবিক, এইসব হৃদয়ঘটিত কোনও সমস্যাই আমার নেই। আমার একটাই সমস্যা, বড় খিদে পায়। অনেকক্ষণ ধরে নানা সুস্বাদু খাবার খেয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সুবিনয় মার্কিন প্রেমিকের মতো লম্বা এক পদক্ষেপে প্রীতির কাছটিতে পৌঁছতেই আমি চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিই। তারপর অন্ধের মতো ঘুরে হেঁটে গিয়ে, হাতড়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি নীচে।

ঠিক সদরের দরজায় রুমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তার কাঁধে একটা ব্যাগ, মুখ গম্ভীর।

বলল, কী খবর?

আমি ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে জানাই, কোনও খবর নেই।

ও আবার বলে, প্রীতি কি আপনাকে রিফিউজ করেছে!

একটু ভেবে নিয়ে আমি ওপরে-নীচে মাথা নাড়ি, করেছে।

ভেবেছিলাম, খুশি হবে। হল না। মুখখানা গোমড়া করে বলল, প্রীতি বড্ড বোকা। একজনের পর একজনের সঙ্গে ইনভলভড হয়ে যাচ্ছে। আজ ওকে একটু বকব।

আমি বললাম, প্লিজ, বকবেন না। ওর মন খুব খারাপ।

কেন?

ওর এ প্রেমটাও কেঁচে গেছে।

রুমা কিছু বলার আগেই সিঁড়িতে প্রচণ্ড ভারী পায়ের শব্দ তুলে সুবিনয় নেমে আসছিল। তার বাঁ কাঁধে একটা পাট করা চাদরের মতো প্রীতির প্রেমিক ভাঁজ হয়ে ঝুলে আছে।

রুমাকে দেখে সুবিনয় খুব স্মার্ট হেসে বলল, লোকটা নেশা করে হল্লা করছিল, নিয়ে যাচ্ছি।

দৃশ্যটা দেখে অসম সাহসী রুমাও শিউরে উঠে কাছে সরে এসে আমার একটা হাত জোরে চেপে ধরে বলল, উঃ মা গো! এ লোকটা কে?

আমি সান্ত্বনার ছলে রুমার ভেজা এলোচুলে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কিছু ভয়ের নেই। আপনি ভয় পাবেন না। আমি তো আছি।

রুমা আমার বুকের সঙ্গে প্রায় লেগে দাঁড়িয়েছিল, এ কথা শুনে হঠাৎ ছিটকে সরে গিয়ে বলল, স্কাউন্ড্রেল।

আমি তবু রাগ করি না। মলিন একটু হাসি। সুবিনয় গিয়ে প্রীতির প্রেমিকের জেফির গাড়ির দরজা খুলে পিছনের সিটে প্রেমিককে শুইয়ে দিয়ে নিজে হুইলে বসল। তারপর ডাকল, উপল, চলে আয়।

রুমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে হঠাৎ বলল, আপনি নিশ্চয়ই গুন্ডা লাগিয়েছিলেন, না? আপনি... আপনি...।

বলতে বলতে রাগে হঠাৎ রুমার ভিতরে সেই ডালমিয়া পার্কের ভলিবল খেলোয়াড়টা জেগে উঠল। তেমনি চিতাবাঘের মতো চকিত ভঙ্গি, তেমনি নিশ্চল নিবদ্ধ চোখে বলের

বদলে আমার মুখের দিকে চেয়ে। তারপর হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ লঘু পায়ে ছুটে এসে তার প্রচণ্ড স্মাশিং-এর ডান হাতখানা তুলল।

আমারও অভিজ্ঞতা বেড়েছে। আগের বারের মতো বোকা দর্শক আমি আর নেই এখন। মাথাটা সরিয়ে নিলাম পিছনে। রুমার আঙুলের ধারালো ডগা কেবল থুতনি ছুঁয়ে গেল।

এক লাফে বাইরে এসে দৌড়ে ফুটপাথ পার হচ্ছি, রুমাও ছুটে এল, পিছন থেকে জামা টেনে ধরার চেষ্টা করল। গাড়ির দরজা খুলতে সুবিনয়ের যেটুকু সময় লেগেছিল সেটুকুর মধ্যে সে আমার গালে নখের আঁচড় বসিয়ে দিল। হাত টেনে ধরার চেষ্টা করল। চেঁচিয়ে লোকজনকে জানান দিতে লাগল, চোর! খুনে! গুন্ডা! পাকড়ো-।

সুবিনয় গাড়ি ছেড়ে দিল। লেকের একটা নির্জন ধারে এক জায়গায় গাড়িটা প্রীতির প্রেমিক সমেত রেখে দিয়ে সুবিনয় আমাকে নিয়ে ফিরতে লাগল।

.

০৮.

মঞ্চসজ্জা একই। সুবিনয়ের সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটের বাইরের ঘর। তেমনি আন্ডারওয়্যার আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সুবিনয় সোফায় চিতপাত হয়ে বসে আছে। সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে একটানা। ফ্ল্যাটে ফিরে এসেই সে প্রীতির কাছ থেকে টুকে-আনা তার প্রেমিকের বাড়ির ফোন নম্বরে ডায়াল করে জানিয়ে দিয়েছে, ঠিক কোথায় এলে তারা লোকটার অচৈতন্য দেহটি খুঁজে পাবে। এখন সে খুবই শান্ত মেজাজে বসে আছে।

আমার গাল থেকে ডেটলের গন্ধ নাকে আসছে। শরীর কিছু দুর্বল লাগছিল। বুকে একটা ভয়।

সুবিনয় তেমনি মুখের এক পাশে আলো আর অন্য পাশে অন্ধকার নিয়ে হঠাৎ মাথাতোলা দিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, ও আর বাঙালি সুবিনয় নেই। ওর মুখে, চোখে চেহারায় বিদেশি ছাপ পড়ে গেছে। কখন যে পড়ল কে জানে!

ও হুবহু মার্কিন উচ্চারণে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি?

আমি সভয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ও আপন মনে একটু হেসে বলল, উই আঃ গোয়িন টু সেল ইন দ্য স্টেটস। হেল্লুভা গুড কান্ট্রি।

আমি মাথা নাড়লাম। ডেটলের গন্ধটাউবে যাচ্ছে ক্রমে। গালটা জ্বালা করছে অল্প অল্প।

সুবিনয় উঠল। দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা হুইস্কির বোতল বার করে ঢক ঢক করে খেয়ে নিল খানিকটা। হাতের পিঠে মুখটা মুছে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে ফিরে বলল, উই ওয়্যার লাভারস ইন আমেরিকা, উই শ্যাল বি লাভারস ইন আমেরিকা। ইউ নো বাডি?

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝেছি।

সুবিনয় আরও খানিকটা নিট হুইস্কি খেয়ে এসে আবার চিতপাত হয়ে সোফায় বসে বলল, আই'ল হ্যাভ প্রীতি, প্রসপেক্ট অ্যান্ড এভরিথিং ইন দ্য স্টেটস। দ্যাটস দ্য কান্ট্রি ফর আস। গিমমি আমেরিকা বাডি, গিমমি আমেরিকা।

বলে একটু হাসে সুবিনয়। তারপর গম্ভীর হয়ে হঠাৎ উঠে সোজা হয়ে বসে বাংলায় বলে, কিন্তু যাওয়ার আগে দুটো খুব জরুরি কাজ আছে।

আমার খিদেটা ক্রমে পেটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। জাগছে। খোঁচা দিচ্ছে আমাকে। আমি একটু কোলকুঁজো হয়ে বসে সুবিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

সুবিনয় বলে, প্রথম কাজ, ক্ষণাকে ডিভোর্স করা। দ্বিতীয় কাজ, টু ইনভেন্ট এ প্যালেটেবল পয়জন ফর দ্য মাইস অফ ইন্ডিয়া। ভারতবর্ষের ইঁদুরদের জন্য একটি সুস্বাদু বিষ।

উঠে পায়চারি করতে করতে সে বলল, দ্বিতীয় কাজটা অনেকখানি এগিয়েছে। ইট উইল বি এ রিভলিউশনারি ইনভেনশন। কী রকম জানিস?

কী রকম?

অনেকটা যেন স্বপ্নের ভিতর থেকে সুবিনয় বলল, অসম্ভব টেস্টফুল বিষ। যেখানেই রাখবি গন্ধে গন্ধে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ইঁদুর ছুটে আসবে আনাচকানাচ থেকে। গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে, আসবে আলমারির তলা থেকে, বইয়ের র‍্যাক থেকে, ভাড়ার ঘর থেকে। অসম্ভব তৃপ্তির সঙ্গে চেটেপুটে খাবে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে চিরদিনের মতো। হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা যেমন টেনে নিয়ে গিয়েছিল ইঁদুরদের, অনেকটা তেমনি। সারা দেশে ইঁদুরদের সমস্ত নড়াচড়ার শব্দ থেমে যাবে। শুধু জমে থাকবে এখানে-সেখানে ইঁদুরের স্তূপ।

আমি সুবিনয়ের দিকে চেয়ে আছি গাড়লের মতো। আমার পেটের ভিতর অন্ধকারে একটা ইঁদুর আমার নাড়ি কাটছে, ছ্যাঁদা করছে পাকস্থলী, নিপুণ দাঁতে করাতের মতো চিরে দু'ভাগ করছে অন্ত্র।

আর-এক ঢোক হুইস্কি খেয়ে সুবিনয় উদগার তুলে বলল, দ্যাট উইল বি হেল্লুভা গুড

ইনভেনশন। বিষটা বের করতে পারলে ওরা আমাকে নোবেল প্রাইজ দেবে। আই শ্যাল বি দ্য থার্ড ইন্ডিয়ান নোবেল লরিয়েট। অ্যান্ড দেন আমেরিকা। গট দ্য আইডিয়া চাম?

আমি মাথা নাড়ালাম।

সুবিনয় আমার কাছে এসে আঁচড়ানো গালটায় এক বার খুব আস্তে হাত রাখল। তাইতে আমার গাল জ্বালা করে উঠে। সুবিনয় একটা দুঃখের চুক চুক শব্দ করে বলল, খুব জোর আঁচড়ে দিয়েছে তোকে। হাঃ হাঃ।

টারজানের মতো আবার খানিক হেসে সুবিনয় ফের গম্ভীর হয়ে বলল, আমি কি তোকে বিশ্বাস করতে পারি উপল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি নিজেই নিজেকে করি না সুবিনয়। আমাকে বিশ্বাস করাটা ঠিক হবে না।

খুব করুণ মুখ করে সুবিনয় বলল, কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই যাকে খুব বিশ্বাসের সঙ্গে একটা জরুরি কাজের ভার দেওয়া যায়।

আমি গালে আঙুল ঘষে ডেটলের গন্ধ আঙুলের ডগায় তুলে এনে শুঁকতে শুঁকতে বলি, কী কাজ?

সুবিনয় তার সোফায় চিতপাত হয়ে বসে মুখটা আড়াল করল। তারপর বলল, পরশুদিন আমি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি।

কী ব্যাপারে? ডিভোর্স।

ও।

সুবিনয় সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কিন্তু কাজটা সহজ নয়। আমার একটা ক্লিন ডিভোর্স চাই।

আমি হেলাভরে বললাম, মামলা কর।

সুবিনয় একটুও না নড়ে বলল, পয়েন্ট কী? এ দেশে ডিভোর্স করা কি সোজা! হাজার রকম ঝামেলা। তা ছাড়া ক্ষণা কিছুতেই ডিভোর্স দেবে না। আমি ওকে চিনি।

তা হলে?

ডিভোর্স আমার চাই-ই। উকিল বলছিল, আমি যদি অ্যাডালট্রিতে ইনভলভড হতে পারি তবে আমার বউ সহজেই এভিডেন্স দেখিয়ে ডিভোর্স পেয়ে যাবে। শুনে আমি হেসেছি। আমি কয়েক শ' অ্যাডালট্রি করলেও ক্ষণা আমার এগেনস্টে মামলা করতে যাবে না, ডিভোর্সও চাইবে না। এ দেশের মেয়েরা যেমন হয় আর কী, ভয়েড অফ অল সেলফ

রেসপেকটস।

তা হলে?

একটা উপায় আছে। ক্ষণাকেই যদি অ্যাডালটিতে ইনভলভড করা যায় তবে আমি এভিডেন্স দেখিয়ে মামলা করতে পারি।

আমি স্থির চোখে চেয়ে থাকি।

বুঝলি?– সুবিনয় বলে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, বুঝেছি। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে?

অ্যাডালট্রি।

কার সঙ্গে?

তেমনি চিতপাত শুয়ে থাকা, মুখ আড়াল করা সুবিনয় একটুও না নড়ে বলল, ক্ষণা।

বলিস কী? আমি আঁতকে উঠে বলি।

সুবিনয় আস্তে করে উঠে বসে। মুখের এক ধারে আলো পড়ে, অন্য ধারে অন্ধকার। গ্রানাইট পাথরের তৈরি মুখ। আমার দিকে চেয়ে থেকে বলে, দেয়ার উইল বি মানি ফর ইট। এনাফ মানি।

আমি মাথা নেড়ে বলি, পাগল!

সুবিনয় স্থির চোখে আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় বলে, তুই কি মরালিস্ট উপল?

দ্বিধাভরে বলি, নননা!

কোথা থেকে হঠাৎ একটা টাকার তোড়া আমার দিকে ছুড়ে দেয় সুবিনয়। আমার হাঁটুতে লেগে সেটা মেঝেতে পড়ে। তুলে নিয়ে দেখি, একশো টাকার দশখানা নোট, টাটকা তাজা নোট, সদ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আনা। এখনও স্টেপলারের পিনে আটকে আছে।

সুবিনয় বলল, স্টার্ট উইথ এ থাউজ্যান্ড। দেয়ার উইল বি মোর থাউজ্যান্ডস

আমি মাথা নেড়ে বলি, এ হয় না সুবিনয়।

কিন্তু আমার গলাটা কেঁপে যায়।

সুবিনয় অতি করুণ স্বরে বলে, অবলাইজ এ ফ্রেন্ড বাডি। গিভ পিস টু এ সাফারিং

সোল।

আমি কী করব তা বুঝতে পারি না। টাকার জন্য আমি চুরি-ডাকাতি করতে গেছি, আমি অনায়াসে নিয়েছি মানিক সাহার চার নম্বর বউ ঝুমুরকে। আমার গোটা জীবনে কোনও নৈতিকতা নেই। উপরন্তু আমার আছে কালব্যাধির মতো একটা খিদে। যখন খিদে মিটে যায় তখনও আবার খিদের চিন্তা থাকে, ভয় থাকে। ক্যানসারের মতো, কুষ্ঠের মতো সেই খিদে কখনও সরে না।

সারাটা জীবন আমার বাবার মতোই আমি কেবল নিষ্ফল পয়সা খুঁজেছি। পাইনি যে তা নয়। কিন্তু গুপ্তধনের মতো, জলপ্রপাতের মতো, বিস্ফোরণের মতো পয়সা কখনও আমরা খুঁজে পাইনি। আগে ছিল, মফসসলে শহরের সিনেমার নতুন ছবি এলে ড্রাম বাজিয়ে রিকশায় বিজ্ঞাপন বেরোত, একটা লোক রিকশা থেকে অবিরল বিলি করত হ্যান্ডবিল। বাচ্চারা প্রাণপণ ছুটত সেই রিকশার সঙ্গে, মুঠো মুঠো হ্যান্ডবিল কেড়ে আনত। একদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম, ঠিক ওইরকম একটা ছ্যাকড়া রিকশা থেকে হুবহু ওইরকম একটা লোক হ্যান্ডবিলের বদলে টাকা বিলি করতে করতে যাচ্ছে। আমি বরাবর ওইরকম অনায়াসে হ্যান্ডবিলের মতো টাকা চেয়েছি। চেষ্টাহীন টাকা, বিনা কষ্টের টাকা।

হাতের আঁজলায় হাজার টাকার দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। একটু কি কাঁদলামও? বললাম, তুমি এলে?

ক্ষণার কথা মনেও রইল না, সুবিনয়ের কথাও না, প্রীতি বা আর কারও কথাও নয়, ডেটলের গন্ধ নাকে আসছিল না আর, গালের জ্বলুনি টেরও পাচ্ছি না। শুধু অনেক টাকার দিকে চেয়ে আছি। ভাবছি, তুমি এলে? কী সুন্দর তুমি?

করবি তো উপল?– সুবিনয় জিজ্ঞেস করল, তারপর বলল, দেয়ার উইল বি মোর থাউজ্যান্ডস।

কী করার কথা বলছে সুবিনয় তা আর আমার মনে পড়ল না। প্রাণভরে টাকার সৌন্দর্য দেখে আমি দুই মুগ্ধ, জলভরা চোখ তুলে তাকাই। ঝাপসা ঘর। ঝাপসা এক অস্পষ্ট মানুষ। ঝাপসা আলো-আঁধারি।

বললাম, করব।

.

০৯.

প্যাকিং বাক্সের ওপর কষ্টকর বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না রাতে। গ্রিলের

চৌখুপি দিয়ে নীলাভ আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ। জ্যোৎস্নার অনেক টুকরো এসে পড়েছে আমার গায়ে, বিছানায় উঠে বসে আমি দুহাতের শূন্য আঁজলা পাতলাম। হাত ভরে গেল জ্যোৎস্নায়। কী অনায়াস, অযাচিত জ্যোৎস্না। ঠিক এইরকমভাবে আমি বরাবর পয়সা চেয়েছি। ঠিক এইরকমভাবে আঁজলা পেতে। অনায়াসে।

ঠিক এই সময়ে আমার বিছানার পায়ের দিকটায় আমার বিবেককে বসে থাকতে দেখলাম। হুবহু যাত্রাদলের বিবেকের মত কালো আলখাল্লা পরা, গালে দাড়ি, মাথায় টুপি, হাতে একটা বাদ্যযন্ত্র। সে গান গাইছিল না, কিন্তু কাশছিল। কাশতে কাশতেই একটু ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কাজটা কি ঠিক হবে উপলচন্দ্র?

একটু রেগে গিয়ে বলি, কেন, ঠিক হবে না কেন? আমি কাজটা করি বা না করি, সুবিনয় ডিভোর্স করবেই। ডিভোর্স না পেলে হয়তো খুনই করবে ক্ষণাকে। ভেবে দেখো বিবেকবাবা, খুন হওয়ার চেয়ে ডিভোর্সই ভাল হবে কি না ক্ষণার পক্ষে।

উপলচন্দ্র, বড্ড বেশি অমঙ্গলের সঙ্গে জড়াচ্ছ নিজেকে। খারাপ হয়ে যাচ্ছ। ওই হাজার টাকা হাতে না-পেলে তুমি ঠিকই বুঝতে পারতে যে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

আমি আমার বিবেকের কাছ ঘেঁষে বসে বললাম, শোনো বিবেকবাবা, তোমাকে বৈকুণ্ঠ ফোটোগ্রাফারের গল্পটা বলি। তেঠেঙে একটা পুরনো ক্যামেরা নিয়ে ফোটো তুলে বেড়াত সে। ছেলেবেলায় সে অনেক বার আমাদের গ্রুপ ফোটো তুলেছে। ক্যামেরার পিছনে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে তাক করত। এত সময় নিত যে আমাদের ধৈর্য থাকত না। বৈকুণ্ঠ তার খদ্দেরদের ধৈর্য নিয়ে মাথা ঘামাত না, সে চাইত একেবারে নিখুঁত ফোটোগ্রাফ তুলতে। শতবার সে এসে একে বাঁ দিকে সরাত, ওকে ডান দিকে হেলাত, কারও ঘাড় বেঁকিয়ে দিত, কারও হাত সোজা করত, কাউকে বলত মুখটা ওপরে তুলুন, 'আঃ হাঃ আপনাকে নয়, আপনি মাথাটা একটু নামান।' এইভাবে ছবি তোলার আগে বিস্তর রিহার্সাল দিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন সে ক্যামেরায় ফিল্মের প্লেট ভরে লেন্সের ঠুলি খুলবার জন্য হাত বাড়াত তখন খুব আশা নিয়ে দম বন্ধ করে বসে আছি, এইবার ছবি উঠবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে বৈকুণ্ঠ হঠাৎ বলে উঠত, উহুঃ! ঠুলি থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে আবার এসে হয়তো কোনও বাচ্চার বুকের বোতাম এঁটে দিয়ে যেত। আবার সব ঠিকঠাক, আবার তুলিতে হাত, ফোটো উঠবে, আমার শরীর নিশপিশ করছে উত্তেজনায়। উঠবে উঠল বলে। কিন্তু ঠিক শেষ সময়ে বৈকুণ্ঠ আবার অমোঘভাবে বলে উঠত, উহুঃ! হতাশায় ভরে যেত ভিতরটা। বৈকুণ্ঠ এসে কাউকে হয়তো একটু পিছনে সরে যেতে বলল। আবার সব রেডি। ঠুলিতে হাত। ছবি উঠল বলে! কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে আবার সেই—উহুঃ! শোনো বিবেকবাবা, আমার ভাগ্যটা হচ্ছে ঠিক ওই বৈকুণ্ঠ ফোটোওয়ালার মতো। যখনই কোনও একটা দাও জোটে, যখনই কোনও পয়সাকড়ির সন্ধান পাই, যখন সব অভাব ঘুচে একটু আশার আলো দেখতে পাই, ঠিক তখনই বেশ। আড়াল থেকে কে বলে ওঠে, উহুঃ!

আমার বিবেক ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল।

আমি বললাম, নইলে বলল, কন্ডাক্টারি করতে গিয়ে কেন নির্দোষ মানুষ সেই হাটুরে

মারটা খেলাম? গোবিন্দর বাড়িতে না হোক চোর-তাড়া করে খেদালে। ডাকাতি করতে গিয়ে প্রথম চোটেই কেন কাজ ঢিলা হয়ে গেল! কোথাও কিছু না, মানিক সাহার ঘাড়ে যখন নিশ্চিন্তে চেপে বসেছি তখনই হঠাৎ তাকেই বা ভাবের ভূতে পেল কেন? সারাদিন আমার পেটে এক নাছোড় খিদের বাস। মাথায় চৌপর দিন খিদের চিন্তা। বিবেকবাবা, একটু ভেবে দেখো, এই প্রথম আমি এক থোকে এত টাকা হাতে পেলাম। বোমা ফাটবার মতো টাকা, জলপ্রপাতের মতো টাকা। এ কাজটা আমাকে করতে দাও। বাগড়া দিয়ো না বিবেকবাবা, পায়ে পড়ি।

আমার বিবেক একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, উপলচন্দ্র, টাকাটা তোমাকে বড় কাহিল করে ফেলেছে হে। শোনো বলি, টাকা থাকলেই যে মানুষ গরিব হয় না তা কিন্তু নয়। দুনিয়ায় দেখবে, যার যত টাকা সে তত গরিব।

আমি আমার বিবেককে হাত ধরে তুলে বললাম, শোনো বিবেকবাবা, এই যে প্যাকিং বাক্স সব দেখছ, এতে করে নানা দেশ থেকে হাজার রকমের কেমিকাল আসে। তার সবটুকু তো আর কোম্পানিতে যায় না। বেশির ভাগই চড়া দামে চোরাবাজারে বিক্রি হয়ে যায়। সুবিনয়ের পয়সার ঢলাঢলি। সেই পয়সার কিছু যদি আমার ভোগে লাগে তো লাগতে দাও। তাতে ওর পূণ্য হবে। দোহাই বিবেকবাবা, আজ তুমি যাও। আজ যাও বিবেকবাবা। আমি একটু নিজের মত থাকি।

বিবেক গ্রিলের বন্ধ দরজা ভেদ করে চলে গেল। জ্যোৎস্নায় আর তার চিহ্নও দেখা গেল না।

আর রবিবার। ডি-ডে।

আজ ক্ষণাকে নিয়ে সুবিনয়ের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্ল্যান মাফিক আজ সকালেই সুবিনয়ের জরুরি কাজ পড়ে গেল। আমাকে ডেকে বলল, উপল, তুই ক্ষণাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয় তো! আমার একটা মিটিং পড়ে গেল আজ। স্টেটস থেকে একটা ডেলিগেশন এসেছে।

ক্ষণা বলল, থাক গে, আমারও তা হলে যাওয়ার দরকার নেই। পরের রবিবার গেলেও হবে।

সুবিনয় আঁতকে উঠে বলল, না না, তুমি যাও। পুজো দেবে মনে করেছ যাবে না কেন? উপল, তুই বরং দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে রেডি হয়ে নে।

ক্ষণা খুব বেজার মুখ করে বলল, কাজের লোকদের যে কেন বিয়ে করা। সপ্তাহে একটা মাত্র ছুটির দিন তাও তোমার ফি রবিবার মিটিং।

সুবিনয়ের দামি রেজারে যখন দাড়ি কামাচ্ছিলাম তখন নার্ভাসনেসের দরুন দু জায়গায় গাল কেটে গেল।

শুনলাম ঘরে ক্ষণা সুবিনয়কে বলছে, তোমার সেফটি রেজার উপলবাবুকে ইউজ

করতে দিলে কেন?

তাতে কী? খুব উদার স্বরে সুবিনয় বলল, উপলের কোনও ডিজিজ নেই। তা ছাড়া ও আমার ভীষণ রেভিয়ারড ফ্রেন্ড। জানো না তো স্কুল কলেজে ও কী সাংঘাতিক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। এ জিনিয়াস ইন ডিসগাইজ।

ক্ষণা বিরক্ত হয়ে বলল, কে কী ছিল তা জেনে কী হবে। এখন কে কীরকম সেইটেই বিচার করা উচিত। আর কখনও তোমার সেফটি রেজার ওকে দিয়ো না।

সুবিনয় খুব ব্যগ্র গলায় বলে, এ রকম বলতে নেই ক্ষণা। উপল একটু চেষ্টা করলেই মস্ত আর্টিস্ট হতে পারত, কিংবা খুব বড় গায়ক কিংবা শিশির ভাদুড়ির মতো অভিনেতা। ও যে সিনেমায় নেমেছিল তা জানো? তারপর ফিল্ম লাইনে ওকে নিয়ে টানাটানি। কিন্তু চিরকালের বোহেমিয়ান বলে ও বাঁধা জীবনে থাকতে রাজি হল না। এখনও ইচ্ছে করলে ও কত কী করতে পারে।

দাড়ি কামানোর পর আমি জীবনে এই প্রথম সুবিনয়ের দামি আফটারশেভ লোশন গালে লাগানোর সুযোগ পেলাম। গন্ধে প্রাণ আনচান করে ওঠে। এ রকম একটা আফটারশেভ লোশন কিনতে হবে। আরও কত কী কেনার কথা মনে পড়ছে সারা দিন! অবশ্যই একটা সেফটি রেজার। কিছু খুব নতুন ডিজাইনের জামা-কাপড়, একটা ঘড়ি, একটা রেডিয়ো...

ক্ষণা স্নান করতে গেল। সেই ফাঁকে যথাসাধ্য সাজপোশাক পরে নিয়েছি। সুবিনয় আমাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, নট ব্যাড। কিন্তু, তুই একটু রোগা। ইউ নিড মাচ প্রোটিন অ্যান্ড এনাফ কারবোহাইড্রেট। কাল সকালেই ডাক্তার দত্তকে দিয়ে একটা থরো চেক আপ করিয়ে নিবি। গুড ফুড অ্যান্ড গুড মেডিসিন উইল মেক ইউ এ হ্যান্ডসাম ম্যান। মনে রাখবি ফিজিকাল অ্যাট্রাকশনে আমাকে বিট করা চাই।

আমি একটু ম্লান হেসে বললাম, টারজান, তোমার হাইট আর বিশাল স্বাস্থ্য কিছুতেই আমার হওয়ার নয়।

সুবিনয় ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে বলল, দেন ট্রাই টু ইমপ্রেস হার বাই আর্ট অর লিটারেচার অর বাই এনি ড্যাম থিং। আই ডোন্ট কেয়ার। আই ওয়ান্ট কুইক অ্যাকশন।

মাথা নাড়লাম।

সুবিনয় একটা সেলফ-টাইমারওলা ক্যামেরা আর একটা সুপারসেনসিটিভ খুদে টেপ-রেকর্ডার এয়ার ব্যাগে ভরে দিয়েছিল। সেইটে কাঁধে ঝুলিয়ে ক্ষণাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম। বাচ্চারা ঠাকুমার কাছে রয়ে গেল। সুবিনয়ের সাত বছরের মেয়ে দোলনা তেমন ঝামেলা করেনি, কিন্তু পাঁচ বছরের ছেলে ঘুপটু সঙ্গে যাওয়ার জন্য ভীষণ বায়না ধরছিল। ক্ষণার খুব ইচ্ছে ছিল সঙ্গে নেয়, কিন্তু সুবিনয় দেয়নি।

ট্যাক্সি ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষণা আর আমি একা। আমার বুকের মধ্যে ঢিবঢিব ভয়ের

শব্দ। গলা শুকনো। শরীর কাঠের মতো পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কিন্তু ক্ষণার কোনও ভয়ডর নেই, স্নায়ুর চাপ নেই। সে আমাকে বাড়ির ফাইফরমাশ করার লোক ভিন্ন অন্যকিছু মনে করে না।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে আসা বাতাসে ক্ষণার আঁচল উড়ে এসে একবার আমার কাঁধে পড়ল। ক্ষণা আঁচল টেনে নিয়ে বলল, আপনার পোশাক-আশাকে কিছু বাসি নেই তো। পুজো দেব ছোঁয়া-টোঁয়া লাগলে বিশ্রী।

এই ক্ষণার সঙ্গে প্রেম! ভারী হতাশ লাগল। বললাম, না, কিছু বাসি নয়।

নিশ্চিন্ত হয়ে ক্ষণা তার হাতের সন্দেশের বাক্স আর শালপাতায় মোড়া ফুল আর ভ্যানিটি ব্যাগ দুজনের মাঝখানে সিটের ফাঁকা জায়গায় রাখল।

ধাঁ ধাঁ করে ট্যাক্সি এগিয়ে যাচ্ছে। পথ তো অফুরান নয়। এখন আমার কিছুটা সহজ হওয়া দরকার। দুটো-চারটে করে কথা এক্ষুনি বলতে শুরু না করলে সময়ের টানাটানিতে পড়ে যাব।

একবার সন্তর্পণে ক্ষণার দিকে তাকালাম। না-সুন্দর, না কুৎসিত ক্ষণা পিছনে হেলে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনছে না। আমি তার চলনদার মাত্র, তার বেশি কিছু নই। কিন্তু এ ভাবটা ভেঙে দেওয়া দরকার।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ ক্ষণা আমার দিকে চেয়ে বলল, ও এল না কেন বলুন তো!

আচমকা ক্ষণার কণ্ঠস্বরে একটু চমকে গিয়েছিলাম। এমনিতে চমকানোর কথা নয়, প্রতি দিনই ক্ষণার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়। কিন্তু এখন আমার মনটা এত বেশি ক্ষণাকনশাস হয়ে আছে যে, ও নড়লেও আমার হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগছে।

বললাম, মিটিং-এর কথা বলছিল।

নিজের গলাটা কেমন মিয়োনো শোনাল।

ক্ষণা এক-দুই পলক আমার দিকে চেয়ে বলল, রোজই যে কেন মিটিং থাকে বুঝি না। লোকেরা এত মিটিং করে কেন?

বুঝতে পারলাম ক্ষণা একটা ক্যাচ তুলেছে। লুফতে পারলে আউট।

ব্যাগে হাত ভরে টেপ-রেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়ে বললাম, এই একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার ভীষণ মিল। আমিও মিটিং পছন্দ করি না।

ক্ষণা মিলটা পছন্দ করল কি না জানি না, বলল, অবশ্য ইম্পর্ট্যান্ট লোকদের প্রায় সময়েই মিটিং করতে হয়। ইম্পর্ট্যান্ট হওয়ার অনেক ঝামেলা।

দক্ষিণ কলকাতা পার হয়ে গাড়ি চৌরঙ্গি অঞ্চলে পড়ল। টেপ-রেকর্ডার চলছে।

আমি বললাম, আপনি গান ভালবাসেন?

গান কে না ভালবাসে! কেন বলুন তো?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, আমি একসময় গাইতাম।

হ্যাঁ শুনেছি, আপনি নাকি ভালই গাইতেন!

ছবি আঁকতাম।

ক্ষণা ভ্রু কুঁচকে বলল, এ সব তো আমি জানি। আপনি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার কিছু হয়নি।

দুঃসাহস ভরে বললাম, আমার বুকের মধ্যে অনেক কথা জমা আছে বুঝলেন! তেমন মানুষ পাই না যাকে শোনাব।

তেমন মানুষ ক্ষণাও নয়। সে শুনতে চাইল না। শুধু বলল, শুনিয়ে কী হবে? সকলের বুকেই কিছু না কিছু কথা জমা থাকে। আমারও কি নেই?

আশান্বিত হয়ে বলি, আছে?

থাকতেই পারে।

বলবেন আমাকে?

ক্ষণা একটু অবাক হয়ে বলল, আপনার আজ কী হয়েছে বলুন তো!

রাস্তার একটা বিধবা বুড়িকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাক্সিটা জোর একটা টাল খেল। আমার মাথাটা বেটাল হয়ে দরজায় ঠুকে গেল একটু। যত না লেগেছে তার চেয়ে কিছু বেশি মাত্রা যোগ করে বললাম, উঃ!

ব্যথা পেলেন?

ভীষণ।

দেখি! বলে ক্ষণা একটু ব্যর্থ হয়ে মুখ এগিয়ে আনে।

আমি মাথাটা এগিয়ে আঙুলে ব্যথার জায়গাটা দেখিয়ে বলি, এইখানে।

ক্ষণার মনে কোনও দুর্বলতা নেই। সে দিব্যি ব্যথার জায়গাটা আঙুল বুলিয়ে পরীক্ষা করছিল। কিন্তু সেই স্পর্শে আমার ভিতরে বিদ্যুৎ খেলছে। সেটা প্রেমের অনুভূতি নয়।

ভয়ের।

ক্ষণা নিজের জায়গায় সরে গিয়ে বলল, তেমন কিছু হয়নি। মন্দিরে গিয়ে একটু ঠান্ডা জল দেবেন ঠিক হয়ে যাবে।

এই ব্যথার প্রসঙ্গ থেকে অনায়াসেই আমি হৃদয়ের কথায় সরে গিয়ে বলতে পারতাম, ব্যথা কি শুধু ওইখানেই ক্ষণা? হৃদয়েও। কিন্তু প্রথমেই অতটা বাড়াবাড়ি কতে সাহস হল না।

দক্ষিণেশ্বরে ক্ষণা জুতো জমা রেখে পুজো দিতে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, পরস্ত্রী নিয়ে আমার এই কর্মতৎপরতা কবে নাগাদ শেষ হবে।

বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে পুজো দিল ক্ষণা। যখন বেরিয়ে এল তখন বেশ বেলা হয়েছে। বেরিয়ে এসেই বলল, উপলবাবু, ট্যাক্সি ডাকুন।

আমি উদাস স্বরে বললাম, গঙ্গার ধার ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন?

এখন গঙ্গা দেখবার সময় নেই। দোলন আর ঘুপটুর জন্য মন কেমন করছে। ওরাও মা ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

অন্তত পঞ্চবটীটা ঘুরে যান। হনুমানকে খাওয়াবেন না?

নিতান্ত অনিচ্ছায় ক্ষণা রাজি হল। রবিবারের ভিড়ে পঞ্চবটী এলাকা থিকথিক করছে। হাজারটা বাচ্চার চেঁচানি, লোকজনের চিৎকার। এর মধ্যে কোনও সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা বৃথা। তবু সহজ হওয়ার জন্য আমি ক্ষণার পাশাপাশি হেঁটে ঘুরতে লাগলাম। কী বলি? কী বললে ক্ষণার হৃদয়কম্পাসের কাঁটা কেঁপে উঠবে তা আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠিক করতে পারছিলাম না।

হঠাৎ বললাম, একটা জিনিস দেখবেন?

কী?

আমি অবিকল হনুমানের নকল করতে পারি।

যাঃ!

সত্যি।

বলে আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। ক্ষণার হাতখানা হঠাৎ ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলাম গঙ্গার আঘাটায় একটু ফাঁকা মতো জায়গায়। আমার আচরণে ক্ষণা অবাক হয়েছে ভীষণ।

একটু হেসে বললাম, আমার সব আচরণকে মানুষের যুক্তি দিয়ে বিচার করবেন না। আমার মধ্যে হনুমানের ইনস্টিংক্ট আছে।

ক্ষণা হাসল না। তবে রাগও করল না। কেবল বড় করে একটা শ্বাস ছাড়ল।

আমি ওর পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে প্রথমে চমৎকার কুক কুক ধ্বনি দিয়ে হনুমানের ডাক নকল করে শোনালাম। তারপর দেখাতে লাগলাম হনুমানের পেট চুলকোনো, চোখের পিটির পিটির, উকুন বাছা, বানর নাচ, মুখ ভ্যাঙাননা।

দু-চারজন করে আমার চারধারে লোক জমে যেতে লাগল। বাচ্চারা হাতে তালি বাজাচ্ছে, লোকজন চেঁচিয়ে বলছে, ঘুরে-ফিরে দাদা। একদম ন্যাচারাল হচ্ছে।

অনেক দিন বাদে পাবলিকের সিমপ্যাথি পেয়ে আমার বেশ ভাল লাগছিল। শেষে গাছ থেকে হনুমানগুলো পর্যন্ত হুপ হুপ করে সাবাস জানাতে থাকে। একটা ছোকরা বলল, দাদা, ওরা আপনার আসল চেহারা চিনতে পেরে গেছে। ডাকছে।

ঘেমে-নেয়ে যখন খেলা শেষ করেছি তখন ভিড়ের মধ্যে ক্ষণা নেই। ভিড় ঠেলে চার দিকে খুঁজতে লাগলাম ওকে। নেই। মাথাটা কেমন ঘোলাটে লাগছিল। খুব কি বোকামি হয়ে গেল। কিন্তু একটা কিছু বাঁধভাঙা কাজ তো আমাকে করতেই হবে। নইলে ও আমাকে আলাদা করে লক্ষ করবে কেন?

হতাশ এবং শ্লথ পায়ে নতমুখে আমি বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি। মনের মধ্যে নানা রকম টানা-পোড়েন।

বাসরাস্তার দিকে আনমনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, একটা থেমে থাকা ট্যাক্সির দরজা একটু খুলে ডাকল, উপলবাবু।

কেঁপে উঠি। কোনও কথা বলতে পারি না। তাকাতেও পারি না ক্ষণার দিকে। শুধু, বাধ্য চাকরের মতো সিটে ওর পাশে উঠে বসি।

কথাহীন নৈঃশব্দ্যে গাড়ির ভিতরটা ভারাক্রান্ত। শুধু মোটরের একটানা আওয়াজ।

শ্যামবাজার পার হয়ে গাড়ি সার্কুলার রোডে পড়ল। ক্ষণা বাইরের দিকে ফেরানো মুখখানা ধীরে আমার দিকে ঘুরিয়ে এনে বলল, আপনার অডিয়েন্স খুশি হল?

আমি লজ্জায় মরে গিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, আমার অডিয়েন্স কেউ তো ছিল না।

ওমা! সে কী! অনেক লোককে তো জুটিয়ে ফেললেন দেখলাম!

ম্লান হেসে বললাম, আমার একজন মাত্র অডিয়েন্স ছিল। সে তো দেখল না!

সে কে?

আপনি।— বলে আমি চতুর হাতে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিই।

আমি! আমি কেন আপনার অডিয়েন্স হতে যাব? ও রকম ভাঁড়ামো করছিলেন কেন বলুন তো? ভারী বিশ্রী।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি সেই বাজিকরের গল্পটা কি জানেন! যে কেবল নানা রকম খেলা দেখিয়ে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়! তার আর-কিছু জানা ছিল না। সে একদিন মাতা মেরির মন্দিরে গিয়ে দেবীকে ভক্তিভরে তার সেই বাজির খেলা নিবেদন করেছিল। দেবী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমিও ওই বাজিকরের মতো আমার যা আছে তাই দিয়ে আপনাকে খুশি করতে চেয়েছিলাম।

আমাকে খুশি করতে এত চেষ্টা কেন?

উদাস স্বরে বললাম, কী জানি!

ক্ষণা একটু হাসল, হঠাৎ বলল, আর কখনও ওরকম করবেন না। ঠিক তো?

আচ্ছা।

.

১০.

আজও সুবিনয় আন্ডারওয়্যার আর গেঞ্জি পরা চেহারা নিয়ে তার ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরের সোফায় চিতপাত হয়ে পড়ে ছিল। সামনে সেন্টার টেবিলে টেপ-রেকর্ডার চলছে।

রেকর্ড শেষ হলে সুবিনয় ধোঁয়া ছেড়ে বলল, নট ব্যাড। তবে আর-একটু ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ না করলে ম্যাচিওর করতে দেরি হবে।

সুবিনয় খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাতে নিট হুইস্কির গেলাস। টপ করে তলানিটুকু গিলে ফেলে আমার দিকে ফিরে বলল, শোন উপল, প্রেমের ভান করলে হবে না। ইউ হ্যাভ টু ফল ইন লাভ উইথ হার। সিরিয়াসলি।

শ্বাস ফেলে বললাম, চেষ্টা করব।

পরশুর অ্যাসাইনমেন্টটা মনে আছে তো? মেট্রোতে।

আমি মাথা নাড়লাম। মনে আছে।

মেট্রোতে সোয়া ছ'টার শোতে পাশের সিটে সুবিনয়ের বদলে আমাকে দেখে ক্ষণা অবাক। বলল, ও কোথায়?

আমি কৃচ্ছ্রসাধনের মতো করে হেসে বললাম, মিটিং

আবার মিটিং। কিন্তু তা বলে ওর বদলে আপনাকে কেন পাঠাল বলুন তো!

নইলে একটা টিকিট নষ্ট হত।

না হয় বেচে দিত।

বাড়ি ফেরার জন্য আপনার একজন এসকর্টও তো দরকার। যখন শো ভাঙবে তখন হয়তো ভিড়ে আপনি বাসে-ট্রামে উঠতেই পারবেন না। তার ওপর আপনি আবার একা ট্যাক্সিতে উঠতে ভয় পান।

ক্ষণার মুখখানা রাগে ক্ষোভে অভিমানে ফেটে পড়ছিল। খানিক চুপ করে থেকে আস্তে করে বলল, ওর সময় কম জানি। কিন্তু এত কম জানতাম না।

এ সময়টায় কথা বলা বা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা বোকামি। আমি ক্ষণাকে সুবিনয় সম্বন্ধে ভাবতে দিলাম। আজও আমার কাঁধে ঝোলানো একটা শান্তিনিকেতনি চামড়ার ব্যাগ। তাতে টেপ-রেকর্ডার। ব্যাগে হাত ভরে সুইচে সতর্ক আঙুল ছুঁইয়ে রেখেছি।

অনেকক্ষণ বাদে বললাম, পান খাবেন?

ও মাথা নাড়ল। খাবে না।

আরও খানিক সময় ছাড় দিয়ে বললাম, খিদে পেয়েছে, দাঁড়ান কাজুবাদাম কিনে আনি। শো শুরু হতে আরও পাঁচ মিনিট বাকি।

বলে উঠে আসছি, ক্ষণাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাইরে কোথাও চা পাওয়া যাবে?

গলার স্বরে বুঝলাম, একটু সময়ের মধ্যেই কখন যেন ও একটু কেঁদে নিয়েছে। গলাটা সর্দি লাগার মতো ভার।

যাবেন? চলুন।

বাইরের একটা রেস্টুরেন্টে ক্ষণাকে বসিয়ে বললাম, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, সময় বেশি নেই।

ও মাথা নেড়ে বলে, আমি ছবি দেখব না। ভাল লাগছে না।

তা হলে?

আপনি দেখুন। আমি চা খেয়ে বাড়ি চলে যাব।

আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। জীবনে কোনও কাজই আমি শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। এটাও কি পারব না?

একটু ভেবে বলি, এ সময়টায় ট্রামে বাসে উঠতে পারবেন না। বরং একটু বসে বা বেড়িয়ে সময়টা কাটিয়ে যাওয়া ভাল।

বেয়ারা আসতেই ক্ষণাকে জিজ্ঞেস করলাম, চায়ের সঙ্গে কী খাবেন? আজ আমি খাওয়াব।

ক্ষণা অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি খাওয়াবেন? কেন, চাকরি পেয়েছেন না কি?

পেয়েছি। মৃদু হেসে বললাম।

কবে পেলেন? কই, চাকরিতে যেতেও তো দেখি না আপনাকে।

একটা শ্বাস ফেলে বললাম, সব চাকরিতে কি আর দূরে যেতে হয়। এই ধরুন না, আপনার সঙ্গে বসে থাকাটাও তো একটা চাকরি হতে পারে।

ক্ষণা কথাটার একটু অন্য রকম মানে করে বলল, আমার সঙ্গে বসে থাকাটা যদি চাকরি বলেই মনে হয় তবে বসে থাকবার দরকার কী?

কথাটা দারুণ রোমান্টিক। টেপ-রেকর্ডারটা চালু আছে ঠিকই, তবু ভয় হচ্ছিল কথাটা ঠিকমতো উঠবে তো! ব্যাটারি কিছুটা ডাউন আছে। সুবিনয় নতুন ব্যাটারি কিনে লাগিয়ে নিতে বলেছিল। আমি ব্যাটারির টাকাটা কিছু বেশি সময় সঙ্গে রাখবার জন্য কিনিনি। যতক্ষণ টাকার সঙ্গ করা যায়। এই সুদিন তো চিরস্থায়ি নয়।

আমি আনন্দে প্রায় স্খলিত গলায় বললাম, চাকরি কী বলছেন? আপনার সঙ্গে এ রকম বসে থাকার চাকরি হয় তো আমি রিটায়ারমেন্ট চাই না।

ক্ষণা রাগ করল না। একটু হেসে বলল, আপনার আজকাল খুব কথা ফুটেছে।

হৃদয় ফুটে উঠলেই মুখে কথা আসে।

এটা পেনাল্টি শট। গোল হবে তো!

ক্ষণা মাথাটা উঁচু রেখেই বলল, হৃদয় ফোটাল কে?

বোঝেন না?

না তো!

তা হলে থাক।

গোল হল কি না তা বুঝবার জন্য আমি উগ্র আগ্রহে ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম।

আমাদের কথাবার্তা বলতে দেখে বেয়ারা চলে গিয়েছিল। আবার এল। বিরক্ত হয়ে বললাম, দুটো মাটন রোল, আর চা।

বেয়ারা চলে গেল। তখন হঠাৎ লক্ষ করি, ক্ষণার মুখখানা নত হয়েছে টেবিলের দিকে। নিজের কোলে জড়ো করা দুখানা হাতের দিকে চোখ নেমে গেল।

গোল! গোল! গোল।

আনন্দে বুক ভেসে যাচ্ছিল আমার। দুইদিনে অগ্রগতির পরিমাণ সাংঘাতিক। আমার ইচ্ছে করছিল, এক্ষুনি সুবিনয়ের ফ্ল্যাটে ছুটে গিয়ে ওকে বিবরণটা শোনাই।

কিন্তু তা তো হয় না। তাই বসে বসে মাটন রোল খেতে হল। ক্ষণা মৃদু আপত্তি করে অবশেষে খেল আধখানা। বাকি আধখানা প্লেটে পড়ে ছিল, আমি তুলে নিলাম। দামি জিনিস কেন নষ্ট হয়?

ক্ষণা বলল, এ মা, পাতেরটা খায় নাকি?

সকলের পাতেরটা খাব আমি তেমন কাঙাল নই। তবে কারও পাতের জিনিস আমার খুব প্রিয় হতে পারে।

যাঃ–ক্ষণা বলল, আপনি একটা কীরকম যেন। আগে কখনও এত মজার কথা বলতেন না তো।

আপনাকে ভয় পেতাম।

কেন, ভয়ের কী?

সুন্দরী মেয়েদের আমি বরাবর ভয় করি।

যাঃ! আমি নাকি সুন্দরী!

প্রতিবাদ করলেও কথাটা ওর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, টের পাই।

ট্যাক্সিতে ফেরার সময়ে আমি বিস্তর মজার কথা বললাম। সুবিনয় মেট্রোয় আসেনি বলে যে দুঃখ ছিল ক্ষণার তা ভুলে গিয়ে ও খুব হাসতে লাগল।

বলল, বাবা গো, হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে গেল।

ক্ষণাকে পৌঁছে দিয়ে সুবিনয়ের ফ্ল্যাটে এসে দেখি সুবিনয় বেশ খানিকটা মাতাল হয়ে

বসে আছে। আমাকে দেখে বলল, সামথিং নিউ বাডি?

আমি অনেকটা মার্কিন অনুনাসিক স্বরে বললাম, ইয়াপ।

সুবিনয় টেপ-রেকর্ডারের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, হেল অফ এ গুড।

টেপ শোনা হয়ে গেলে সুবিনয় মাথা নেড়ে বলল, কাল থেকে ওকে তুমি তুমি করে বলবি। আর-একটু ইন্টিম্যাসি দরকার। ইঁদুরের বিষটা আমি প্রায় তৈরি করে ফেলেছি। ভিসা পেয়ে যাচ্ছি শিগগির। স্টেটসের চারটে বিগ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়ে আছে। মেক ইট হেসটি চাম। কাল কোথায় যেন?

চিড়িয়াখানা। সেখানে প্রথম ফোটোগ্রাফ নেওয়ার চেষ্টা করব।

সুবিনয় চিন্তিত হয়ে বলে, বাট দ্য চিলড্রেন উইল বি দেয়ার। দোলন আর ঘুপটু।

তাতে কী! ওদেরও তুলব, আমাদেরও তুলব।

দ্যাটস এ গুড বয়।

পরদিন চিড়িয়াখানায়। আমি আর ক্ষণা পাশাপাশি হাঁটছি। দোলন আর ঘুপটু হাত ধরাধরি করে সামনে। ক্ষণা ঘড়ি দেখে বলল, এখনও দোলনের বাবা আসছে না কেন বলুন তো! বেলা দুটোর মধ্যে আসবে বলেছিল।

আসবে। আচ্ছা ক্ষণা, আপনার বয়স কত?

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করা অভদ্রতা না! মৃদু হেসে ক্ষণা বলে।

আমি আগের থেকে অনেক সাহসী আর চতুর হয়েছি। ঠিক সময়ে ঠিক কথা মুখে এগিয়ে আসে।

সিরিয়াস মুখ করে বলি, আপনাকে এত বাচ্চা দেখায় যে, ছেলেমেয়ের মা বলে বোঝা যায় না।

আপনি আজকাল খুব কমপ্লিমেন্ট দিতে শিখেছেন দেখছি!

ক্ষণা একটু বিরক্তির ভান করে বলল। ভান যে সেটা বুঝলাম ওর চোখের তারায় একটু চিকিমিকি দেখে।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট?— আমি উদবেগ চাপতে পারি না গলার স্বরে।

ক্ষণা হেসে বলে, মেয়েরা এ সব বললে খুশি হয় সবাই জানে। কিন্তু আমার বয়স বসে নেই উপলবাবু। পঁচিশ চলছে।

আমি একবার ক্ষণার দিকে পাশ চোখে তাকিয়ে দেখলাম। দুঃখের বিষয়, ক্ষণাকে পঁচিশের চেয়ে বেশিই দেখায়।

আমি খুব বাজে অভিনেতার মতো অবাক হওয়ার ভাব করে বললাম, বিশ্বাস করুন, অত মনেই হয় না। বাইশের বেশি একদম না। আমার কত জানেন?

সত্যিকারের বয়সের ওপর আরও চার বছর চাপিয়ে বললাম, চৌত্রিশ।

ক্ষণা অবাক হয়ে বলে, কী করে হয়? আপনার বন্ধুর বয়স তো মোটে ত্রিশ, আপনারা তো ক্লাসফ্রেন্ড? একবয়সিই হওয়া উচিত।

সে কথায় কান না দিয়ে বললাম, শোনো ক্ষণা, আমার চেয়ে তুমি বয়সে অনেক ছোট। তোমাকে আপনি করে বলার মানেই হয় না।

এটা গিলতে ক্ষণার একটু সময় লাগল। কিন্তু ভদ্রতাবশে সে না-ই বা করে কী করে! তাই হঠাৎ ‘ঘুপটু, ঘুপটু’ বলে ডেকে কয়েক কদম দ্রুত এগিয়ে গেল।

আমি ওকে সময় দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে আনমনে ঘাসের ওপর হাঁটি। ডাক্তার দত্ত আমার শরীরের সব চেক-আপ করেছেন। তাঁর মতে আমার অনেক রকম চিকিৎসা দরকার। পেট, বুক, চোখ কিছুই সাউন্ড নয়। দত্ত পেল্লায় ডাক্তার, বিলেতফেরত, আধহাত ডিগ্রি, পুরো সাহেবি মেজাজের লোক। আমাকে দেখেই প্রথম দিন বলে দিয়েছিলেন, ব্লাড, ইউরিন, স্টুল, স্পুটাম সব পরীক্ষা করিয়ে তবে আসবেন। সে এক বিস্তর ঝামেলার ব্যাপার। সব রিপোর্ট দেখে দেখে পরে একদিন বললেন, ম্যালনিউট্রিশনটাই মেইন। এই বলে অনেক ওষুধপত্র, টনিক লিখে দিলেন। এক কোর্স ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে। পেরিয়াকট্রিন ট্যাবলেট খেয়ে খিদে আরও বেড়েছে। ঘুমও। অল্প একটু মোটা হয়েছি কি! আত্মবিশ্বাসও যেন আসছে!

পাখির ঘর দেখা হয়ে গেলে আমরা জলের ধারে এসে বসলাম। ক্ষণা আর বাচ্চাদের গুটি ছয়-সাত ছবি তোলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও ভাইটাল ছবিটা বাকি। ক্ষণার আর আমার একটা। যুগল ছবি। এভিডেন্স।

দোলন আর ঘুপটু টিফিন বাক্স খুলে ছানা আর বিস্কুট খাচ্ছে। রোদে ঘুরে ঘুরে ওদের মুখ-চোখ লাল, আনন্দে ঝিকিমিকি চোখ। ক্ষণা একটু দুশ্চিন্তার ভাব মুখে মেখে শ্রান্ত গা ছেড়ে দিয়ে বসে থেকে বলল, উপলবাবু, আজও ও এল না। আজকাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও রাখছে না। কেন বলুন তো?

কাজের মানুষ। বলতে বলতে আমি চার দিকে আলোর পরিমাপ দেখে ক্যামেরার অ্যাপারচার ঠিক করি, শাটারের স্পিড নির্ণয় করি। সবই আনাড়ির মতো। ঠিকঠাক করে ক্ষণাকে বললাম, তোমার এই দুঃখী চেহারাটা ছবিতে ধরে রাখি।

এই বলে টাইমার টেনে দিয়ে ক্যামেরাটা একটু দূরে ফ্লাস্কের ওপর সাবধানে উঁচুতে বসাই। শাটার টেপার পর মাত্র দশ সেকেন্ড সময়। তার মধ্যেই আমাকে দৌড়ে গিয়ে

ক্ষণার পাশে বসতে হবে।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। আমি ওর পাশে বসব গিয়ে, সেটা কি ওকে আগে বলে নেব? না কি আচমকা ঘটাব কাণ্ডটা! ব্যাপারটা যদি ও পছন্দ না করে? যদি শেষ মুহূর্তে সরে যায়!

ক্ষণা হতাশ গলায় বলল, ছবি তুলে কী হবে? আমার অনেক ছবি আছে।

আমার নেই। আমি বললাম। কথাটা সত্যি। ছেলেবেলায় বৈকুণ্ঠ ফোটোওলা তুলেছিল, বড় হয়ে আর ছবি তোলা হয়নি।

ক্ষণা হাত বাড়িয়ে বলল, ক্যামেরাটা দিন, আমি আপনার ছবি তুলে দিচ্ছি।

আমি ভিউ ফাইন্ডারে ক্ষণাকে খুব যত্নে ফোকাস করছিলাম। ওর বাঁ দিকে একটু জায়গা ছেড়ে দিলাম যাতে আমার ছবি কাটা না পড়ে যায়। বেশ খানিকটা দূর থেকে তুলছি, কাটা পড়বে না। তবু ভয়।

ও ছেলেমানুষের মতো ক্যামেরার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। হাসি মুখে বলছে, আমি অবশ্য আনাড়ি। আপনি সব যন্ত্রপাতি ঠিক করে দিন, আমি শুধু শাটার টিপব।

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি চিড়িক দিয়ে উঠল। ক্যামেরায় যে সেলফ টাইমার আছে তা ক্ষণার জানার কথা নয়। পৃথিবীর খুব বেশি কিছু জানা নেই ক্ষণার। আমি শাটার টিপে উঠে গিয়ে ওর পাশে বসলে ও হয়তো টেরও পাবে না যে ছবি উঠল।

কিন্তু অসম্ভব নার্ভাস লাগছিল শেম মুহূর্তে। পারব তো! ক্ষণা কিছু সন্দেহ করবে না তো!

ভাবতে ভাবতেই শাটারটা টিপে দিলাম। চিড় চিড় করে টাইমার চলতে শুরু করে। আমি দ্রুত পায়ে জমিটা পার হয়ে ক্ষণার কাছে চলে আসি।

কিন্তু সময়টা ঠিকমতো হিসেব করা হয়নি। যে মুহূর্তে আমি ক্ষণার পাশে এসে হুমড়ি খেয়ে বসেছি ঠিক সেই সময়ে দোলন আধখানা কেক হাতে দৌড়ে এসে ক্ষণার ঘাড়ের ওপর উপুড় হয়ে কানে কানে বলল, মা। বাথরুমে যাব।

টাইমারের শেষ ক্লিক শব্দটা শুনতে পেলাম। হতাশা।

ক্ষণা উঠে গিয়ে দোলনকে বাথরুম করিয়ে আনল। ততক্ষণে আমি ক্যামেরাটা আবার তৈরি করে রেখেছি।

ক্ষণা এসে ঘাসের ওপর রাখা ব্যাগ, টিফিন বাক্সর পাশে তার আগের জায়গায় বসল। কিন্তু এবার তার কোলে এসে বসল ঘুপটু। অসম্ভব অধৈর্য বোধ করতে থাকি।

দোলন জলের ধারে গিয়ে হাঁস দেখে। ঘুপটু একটু বাদে তার দিদির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ক্ষণা ব্যাগট্যাগ গোছাতে গোছাতে বলে, ওর আজও বোধহয় মিটিং। এল না। চলুন, আমরা চলে যাই।

আমি দাঁতে দাঁত টিপে রাখি। এবার আমাকে সত্যিই বেপরোয়া কিছু করতে হবে। সময় চলে যাচ্ছে।

হিংস্র আঙুলে শাটারটা টিপে টাইমার চালু করেই আমি দুই লাফে ক্ষণার পাশে এসে পড়ি। ক্ষণা অবাক হওয়ারও সুযোগ পায় না। আমি ক্ষণার গালে গাল ঠেকিয়ে বসেই ওর কাঁধে হাত রেখে বলি, ক্ষণা, দেখো!

ক্ষণা আমার দিকে অবাক মুখ ফিরিয়ে বলল, কী দেখব?

ওই যে, একটা অদ্ভুত পাখি উড়ে গেল।

ক্ষণা খুব বিস্মিত, বিরক্ত। আমি ক্ষণার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, বোধহয় চিড়িয়াখানার সেই ম্যাকাও পাখিটা পালিয়ে গেল।

ক্ষণা সরে বসে ব্যাগ গোছাতে গোছাতে বলল, আপনার কী হয়েছে বলুন তো? এমন সব কাণ্ড করছেন।

অনেকক্ষণ আগে সেলফ টাইমার শেষ হয়েছে। আমার সারা শরীরে ঘাম দিচ্ছে। হাত পা কাঁপছে উত্তেজনায়। অবসাদে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

.

পরদিন প্রিন্টটা দেখল সুবিনয়। ছবিটা ব্লো-আপ করা হয়েছে বিরাট করে।

নট ব্যাড চাম। ইউ হ্যাভ মেড প্রোগ্রেস। – বলে হাসল।

ছবিটা অসম্ভব ভাল হয়েছে। পিছনে মস্ত একটা খেজুর গাছের মতো ঝুপসি গাছ, সেই পটভূমিতে আমাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমার গালের সঙ্গে প্রায় ছুঁয়ে ক্ষণার গাল, ওর কাঁধে আমার হাত। দু'জনেই দুজনের দিকে হেলে বসে আছি। কী সাংঘাতিক স্ক্যান্ডালাস ছবি! অথচ কত মিথ্যে!

সুবিনয় হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণ পর্যন্ত পায়চারি করছিল। মুখে মৃদু একটু হাসি, আর অন্যমনস্কতা। এক সময়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, হ্যাভ ইউ ফলেন ইন লাভ উইথ হার বাড়ি?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, জানি না।

ইউ লুক ডিফারেন্ট। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুবিনয় বলে।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। হয়তো সত্যিই আমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। আমি কি একটু মোটা হয়েছি! আজকাল ঘুম হয়। খিদের চিন্তায় কষ্ট পাই না।

ঠিক আগের দিনের মতো সুবিনয় আজও একশো টাকার পাঁচখানা নোট ছুড়ে দিল আমার দিকে। বলল, এক্সপেন্সেস।

মাথা নাড়লাম। উত্তেজনায় শরীর গরম হয়ে ওঠে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে হাঃ করে সুবিনয় একটা শব্দ করল। তারপর বলল, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না উপল। আই বিলিভ নান, অ্যান্ড দ্যাট মেকস মি ভেরি লোনলি।

কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু চিন্তা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম। তারপর উঠে চলে এলাম এক সময়ে। সুবিনয় এখন অনেক রাত পর্যন্ত মদ খাবে।

দু দিন পর সুবিনয় তার সুটকেস গুছিয়ে দিল্লি গেল। আসলে কোথাও গেল না। শুধু আমি জানলাম, সুবিনয় সাউথ এন্ড পার্কের ফ্ল্যাটে ক'দিন লুকিয়ে থাকবে। আমাকে গোপনে বলল, নাউ ইউ উইল বি ইন এ ফ্রি ওয়ার্ল্ড। বোথ অব ইউ।

দীর্ঘ খরার পর সেই রাতে অসম্ভব বৃষ্টি নামল। কী যে প্রবল বৃষ্টি। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে অবিরল ছাঁট আসতে লাগল। ঘুমের চটকা ভেঙে উঠে বসলাম। গহিন মেঘ সিংহের মতো ডাকছে। জলপ্রপাতের মতো নেমে আসে জল।

বিছানা গুটিয়ে প্যাকিং বাক্সগুলো যত দূর সম্ভব দেওয়ালের দিকে সরিয়ে আনতে থাকি। একটু-আধটু শব্দ হয়। বিছানাটা পেতেও কিন্তু শোয়া হয় না, বৃষ্টির ছাঁট হু হু করে সমস্ত বারান্দাকে ছেয়ে ফেলছে।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসে থাকি বাতি নিবিয়ে। কিছু করার নেই। ঝড় বৃষ্টি আমাকে অনেক বার সহ্য করতে হয়েছে। আজও বসে বসে গাড়লের মতো ভিজতে থাকি।

সুবিনয় আর ক্ষণার ঘরের দরজা খোলবার শব্দ হল। আমার পাঁজরার নীচে ভিতু খরগোশের মতো একটা লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। কোনও কারণ নেই। তবু।

ঘরের আলোয় দরজার চৌখুপিতে ক্ষণা ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে অন্ধকারে বারান্দাটা একটু দেখে নিয়ে সাবধানে ডাকল, উপলবাবু।

ক্ষীণ উত্তর দিলাম, উ!

আপনি কোথায়?

এই তো।

ক্ষণা বারান্দার আলো জ্বেলে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, এ কী! ছাঁট আসছে না কি!

মৃদু হেসে বললাম, ও কিছু নয়। বৃষ্টি থেমে যাবে।

ক্ষণা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বারান্দার বৃষ্টির ঝাপটা দেখল, আমার বিছানায় একবার হাত ছুঁইয়েই বলল, এ মা! বিছানাটা ভিজে গেছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, একটু।

একটু নয়, ভীষণ ভিজে গেছে। এ বিছানায় কেউ শুতে পারে না।

এ কথার উত্তর হয় না। চুপ করে থাকি।

ক্ষণা খুব সহজভাবে বলল, আপনার বন্ধুর বিছানা তো খালি পড়ে আছে, আপনি ঘরে এসে শোন। আমি আমার শাশুড়ির ঘরে যাচ্ছি।

কেঁপে উঠে বলি, কী দরকার!

আসুন না!

সন্তর্পণে উঠে আলো-জ্বলা ঘরের উষ্ণতায় চলে আসি। বগলে বিছানা। কাঁধের ব্যাগে গুপ্ত টেপ-রেকর্ডার। সুইচ টিপে রেকর্ডার চালু করি। ঠিক এ রকমটাই কি সুবিনয় চেয়েছিল? ওর ইচ্ছাপূরণ করতেই কি বৃষ্টি নামল আজ!

ক্ষণা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ও এত বড় চাকরি করে, তবু এই বিচ্ছিরি বাসায় যে কেন থাকা আমাদের বুঝি না। একটা এক্সট্রা ঘর না থাকলে কি হয়! ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসছে যাচ্ছে। কেন এ বাসা ছাড়ে না বলুন তো?

ছাড়বে।–সংক্ষেপে বললাম।

ছাড়বে, আমি মরলে।

ক্ষণা সুবিনয়ের শূন্য বিছানার স্ট্যান্ডে দ্রুত হাতে মশারি টাঙিয়ে দিল। তারপর নিজের বিছানা থেকে বালিশ আর ঘুমন্ত ঘুপটুকে কোলে নিয়ে বলল, দোলন রইল।

থাক।

আসছি। বলে ও ঘরে গেল ক্ষণা। আলো জ্বালাল। শাশুড়ির সঙ্গে কী একটু কথা বলল সংক্ষেপে। আবার এসে দোলনের পাশে বালিশ ঠেস দিয়ে বলল, বড় ছটফট করে মেয়েটা। পাশ ফিরতে গিয়ে পড়ে না যায়।

ক্ষণা?—আমি ডাকলাম।

বলুন।

এত কাণ্ড না করলেই চলত না? আমি তো বরাবর বারান্দায় শুই। শীতে, বর্ষায়।

ক্ষণা হঠাৎ সোজা হয়ে আমার দিকে তাকাল। মুখখানা লজ্জায় মাখানো। আস্তে করে বলল, দোষ কি শুধু আমার? আপনার বন্ধু কেন এইটুকু ছোট্ট বাসায় থাকে?

বাসাটা ছোট নয়। আমি জানি, ইচ্ছে করলে বাইরের ঘরের মেঝেতেও ওরা আমাকে শুতে বলতে পারত। বলেনি। আর আজ কত আদর করে বাড়ির কর্তার বিছানা ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আমি হেসে বললাম, তবে কি আমি থাকব বলেই তোমাদের একটা বড় বাসা দরকার ক্ষণা?

শুধু সেজন্যই নয়। কত জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি আমাদের ঘর দেখছেন না? বাচ্চাদের একটা পড়াশুনো করার ঘর নেই।

এগুলো কাজের কথা নয়। আমি বললাম, আমার তো এ বাড়িতে থাকবার কথা নয়। অনেক দিন হয়ে গেল। তুমি কষ্ট করছ দেখে মনে হচ্ছে, আর এখানে আমার থাকা ঠিক হচ্ছে না।

ক্ষণা মৃদু হেসে বলল, থাক, এত রাতে আর কাব্য করতে হবে না। ঘুমোন।

ক্ষণা, আমার ধারণা ছিল তুমি আমাকে একদম দেখতে পারো না। তোমাকে ভীষণ অহংকারী বলে মনে হত।

ক্ষণা একটু ইতস্তত করে বলল, আপনাকেও আমার অন্য রকম মনে হত যে।

কীরকম?

মনে হত, আপনি ভীষণ কুঁড়ে।

এখন?

এখন অন্য রকম।

কীরকম ক্ষণা?

খুব মজার লোক। বলে ক্ষণা হাসল। বেশ হাসিটি। চমৎকার দেখাল ওকে।

কবে থেকে?

যেদিন সেই হনুমানের নাচ দেখিয়েছিলেন। ও মা, আমি তো দেখে অবাক! ওইরকম

একটা ভিতু গোছের লোক যে অমন কাণ্ড করতে পারে ধারণাই ছিল না।

আমি কি কেবলই মজার লোক?

ভীষণ মজার।

করুণ মুখ করে বলি, তার মানে কি আমার ব্যক্তিত্ব নেই?

ক্ষণা হাই তুলে বলল, পরে বলব।

চলে গেল।

১১.

টাকার ব্যাপারে আমার কাউকে তেমন বিশ্বাস হয় না। না ব্যাঙ্ক, না পোস্ট অফিস। আমার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হল মাসি।

মধু গুপ্ত লেন-এর বাড়ির সামনে দুটো রকে আজ বড় তরফ বা ছোট তরফের কেউ ছিল না। কিন্তু ছোট তরফের রকে গুটি চারেক ছোকরা ছেলে বসে আছে।

বড় তরফের সদরে ঢুকবার মুখে ছেলেগুলোর একজন আমাকে ডাকল, এই যে মোসাই, শুনুন।

নানা চিন্তায় মাথাটা অন্য রকম। ডাকটাও কেমন যেন। শরীরটা কেঁপে গেল।

দু পা এগিয়ে বললাম, কী?

যে ছেলেটা ডেকেছিল তার মুখখানার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি, এ ছোকরা বিস্তর পাপ করেছে। মুখে কাটাকুটির অনেক দাগ, শক্ত ধরনের চেহারা, চোখ দুটোয় একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি। তার বাঁ হাতটার বুড়ো আঙুল বাদে আর চারটে আঙুল নিশ্চিহ্ন। আঙুলহীন হাতের চেটোটা খুন্তির ডগার মতো দেখাচ্ছে। সেই আঙুলহারা হাতের চেটোয় খুব কর্তৃত্বের একটু হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল।

কাছে যেতেই বলল, কোথায় যাচ্ছিলেন?

গিরিবাবুর বাড়িতে।

গিরিবাবু কে হয় আপনার?

আত্মীয়।

কীরকম আত্মীয়?

ভড়কে গিয়েছিলাম। আত্মীয়তাটা মনে করতে একটু সময় লাগল। তারপর বললাম, সম্পর্কে মামা।

অন্য একটা ছেলে ওপাশ থেকে বলল, ছেড়ে দে সমীর। আসে মাঝে মাঝে। রিলেটিভিটি আছে। যান দাদা, ঢুকে পড়ুন।

কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই হঠাৎ কপাটের আড়াল থেকে

গামছা-পরা খালি গায়ে গিরিবাবু বেরিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে ভিতরবাগে টেনে নিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় বললেন, কী বলল ওরা বলো তো?

আমি কে জিজ্ঞেস করছিল। অবাক হয়ে বলি, কী হয়েছে মামা?

আর বলো কেন উপল ভাগনে, আমাদের বড় বিপদ চলছে। বাড়ির বাইরে বেরোনোই এখন মুশকিল। কেউ এলে তারও বিপদ।

এই বলে গিরিবাবু আবার কলঘরে ঢুকে যান।

বাড়িটা থমথম করছে। বড়গিন্নি সিঁড়ির মাঝ বরাবর পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন, আমাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, কে? কে? ও উপল বুঝি?

দেখি, বড়গিন্নি বেশ রোগা হয়ে গেছেন। মুখ থমথমে। মাঝসিঁড়ি থেকেই আবার কী ভেবে উপরে উঠে গেলেন।

মাসি আমাকে দেখে একটা চোখে বড় করে চাইল। মুখখানায় নরম কয়েকটা ঢেউ খেলে গেল যেন।

আয়।

এমনভাবে বলল যেন এতক্ষণ আমার জন্যই বসে ছিল মাসি। যেন আমার জন্যই সব সময়ে বসে থাকে।

জলচৌকিতে বসে বললাম, কী ব্যাপার গো মাসি?

মাসি শ্বাস ছেড়ে বলল, মানুষ কি আর মানুষ আছে! সেই গুন্ডা ছেলেটা জ্বালিয়ে খাচ্ছে বাবা। ভাবগতিক যা দেখছি, শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচবার জন্য কর্তা-গিন্নি মিলে কেতকীকে না ওই গুন্ডাটার হাতেই তুলে দেয়। ওরা তো রকেই বসে থাকে, তোকে ধরেনি?

ধরেছিল।

সবাইকে ধরছে। পাছে মেয়ে পাচার করে দেওয়া হয় সেইজন্য পাহারা দিচ্ছে। ছোট তরফ ওদের পক্ষে। দুই তরফে দিনরাত ঝগড়া হচ্ছে।

কেতকী কোথায়?

তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হয় না। একদম ঘরবন্দি। দিনরাত কান্নাকাটি। মাসি এই বলে একটু শ্বাস ছাড়ে। তারপর একটা চোখে আমার দিকে অভিমানের দৃষ্টি দিয়ে বলে, তুই যদি একটু মানুষের মতো হতিস।

হেসে বলি, দুনিয়ায় মানুষের অভাব কী! আমার জন্য তুমি আর অত ভেবো না মাসি।

তোর কথা ছাড়া আর যে কোনও ভাবনা আসে না মাথায়। মাসি মুখ করুণ করে বলল, তোর কথা ভাবতে ভাবতেই সারা দুনিয়ার কথা ভাবি। মনে হয়, পৃথিবীটা যদি আর-একটু ভাল জায়গা হত, অভাব-টভাব যদি না থাকত, মানুষ যদি আর-একটু দয়ালু হত, তবে আমার উপলটার এত দুর্দশা হত না। তোর যে খিদে পায় সে যদি সবাই বুঝত!

অবাক হয়ে বলি, উরে বাবা, কত ভাবো তুমি।

কত ভাবি। এই যে কাক, কুকুর, বেড়ালদের ভূত-ভোজন করাই তাও তোর কথা ভেবে। ভাবি কী, ওরা যদি আশীর্বাদ করে তবে আমার উপলের একটা গতি হবে হয়তো।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকি।

মাসি বলে, বড় ভাল ছিল মেয়েটা। তোর সঙ্গে মানাতও খুব।

গুন্ডাটা কি ওকে বিয়ে করতে চায় মাসি?

তাই তো শুনি, আমার মনে হয়, ছোট তরফের টাকা খেয়ে এ সব করছে।

বাজে কথায় সময় নষ্ট। আমি টাকাটা বের করে হাতের চেটোর আড়ালে মাসির কোলে ফেলে দিয়ে বললাম, সাবধানে রেখো।

মাসির একটা চোখই পটাং করে এত বড় হয়ে গেল। বলল, ও মা! তোর কি তা হলে কিছু হল? ও উপল, কোথায় পেলি?

বিরক্ত হয়ে বলি, অত জেরা করো কেন বলো তো?

মাসি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, ভাল টাকা তো! চুরি ছ্যাঁচড়ামি করিসনি তো বাপঠাকুর!

এই কি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস?

মাসি আঁচলের আড়ালে টাকা লুকিয়ে নিয়ে রেখে এল। এসে ফিসফিস করে বলল, কেতকী তোকে ডাকছে।

কেন?

যা না। সিঁড়ির নীচেকার ঘরে আছে। একটু বসে যা, বড় কর্তা কলঘর থেকে বেরিয়ে কাপড় মেলছে, ও ওপরে যাক।

একটু বাদে সিঁড়িতে কম্প তুলে গিরিবাবু ওপরে উঠে গেলেন। মাসি ভাত বাড়তে বসল। আমি সুট করে বেরিয়ে সিঁড়ির আড়ালে সরে যাই।

এ ঘরটায় মাসি থাকে। পরদা সরাতেই কেতকীকে দেখলাম। খাটের ওপর উপুড় হয়ে শোওয়া, চুলগুলি ঝেঁপে আছে ওর মুখ আর মাথা। ডাকতে হল না, কী করে যেন টের পেয়ে ও উঠে বসল। তখন দেখি, ওর চেহারাটা খুব ভীষণ রকমের খারাপ হয়ে গেছে। মোটা গরাদ দেওয়া ছোট জানালা দিয়ে একটুখানি আলোর যে আভা আসছে ঘরে তাতে দেখা যায়, কেতকী অনেক কাল হয়ে গেছে বুঝি। সমস্ত মুখ ফুলে আছে অবিরল কান্নার ফলে।

কোনও ভূমিকা না করেই কেতকী ভাঙা স্বরে বলল, আমি যাব।

অবাক হয়ে বলি, কোথায়?

যেখানেই হোক। এ বাড়ির বাইরে।

আমি কৃশকায় মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকি। কত বাধা ওকে ঘিরেছে আজ! বললাম, তোমার যাওয়ার কোনও জায়গা ঠিক করা আছে?

ও মাথা নেড়ে বলল, না।

তা হলে?– আমি দ্বিধায় পড়ে বলি।

কেতকীর চোখে ফের জল এল। তীব্র সেই চোখে চেয়ে বলল, আজ মা কী বলেছে জানেন? বলেছে, তোকে নিয়ে যখন এত অশান্তি তখন তুই ওই গুণ্ডাটাকেই বিয়ে কর। অথচ মা ক’দিন আগেই মিথ্যে সন্দেহ করে আমাকে মেরেছিল। আমি এ বাড়িতে থাকব না। আমাকে কোথাও নিয়ে যাবেন?

বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা খাই। আশা জাগে, লোভ জাগে, ইচ্ছের নানা রঙের বর্ণালী খেলা করে। কিন্তু আমি কোথায় নিয়ে যাব ওকে? আমার তো কোনও জায়গা নেই।

আমি মাথা নিচু করে বলি, সেটা কি হয়?

কেন হয় না উপলদা? আমার লজ্জা করার সময় নেই, নইলে এত সহজে কথাটা বলতে পারতাম না। শুনুন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।

এত চমকে গিয়েছিলাম যে, মাথাটা চক্কর মারল। খাটের স্ট্যান্ড ধরে সামলে নিলাম। একটু সময় নিয়ে বললাম, কেন আমাকে বিয়ে করবে কেতকী?

এ প্রশ্নটা সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে জটিল।

কেতকী বলল, করব। ইচ্ছে। আপনি রাজি নন?

আমি মৃদুস্বরে বলি, শুনে লজ্জা পাই কেতকী। আমি বড় সামান্য মানুষ।

কেতকীর মুখ উদাস হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে রইল শূন্যের দিকে চেয়ে। তারপর আস্তে বলল, পিসি বলেছিল, আপনি রাজি হবেন।

বিপদের মধ্যে পড়ে তুমি উলটোপালটা ভাবছ। বিপদ কেটে গেলে দেখবে, এ এক মস্ত ভুল।

কেতকী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, এরকম কথা জীবনে এই প্রথম বললাম উপলদা। বেহায়ার মতো। আর কাউকে বলিনি কখনও।

বলে উপুড় হয়ে পড়ল বালিশে। কাঁদতে লাগল।

আমি কখনও ব্যায়াম-ট্যায়াম করিনি। গায়ে জোর নেই। তেমন কিছু সাহসও আমি রাখি না। কোনওক্রমে বেঁচে আছি পৃথিবীতে, এই ঢের। কেতকীর জন্য আমি কী করতে পারি?

ঘর থেকে বেরোবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই বিবেকের সঙ্গে দেখা। সেই কালো জোব্বা পরা কেশো বুড়ো, হাতে বাদ্যযন্ত্র। কাশতে কাশতে বলল, কাজটা কি ঠিক হল উপলচন্দ্রের?

তার আমি কী জানি বিবেকবাবা? দুনিয়ার মানুষ অধিকাংশ কাজই করে ভাল-মন্দ না ভেবে। তারা তো সবটা দেখতে পায় না।

তবু ভেবে দেখো আর একবার।

বলো কী বিবেকবাবা, শেষে গুন্ডার হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে প্রাণটা যাবে। যদি প্রাণ বাঁচাতে পারিও তা হলেও বা বউ নিয়ে খাওয়াব কী? আবার মেয়ে ভাগানোর জন্য ঝামেলাও কি কম হবে?

এই সময়টায় আমার বিবেকের একটা জোর কাশির দমক এল। সেই সুযোগে আমি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসি।

সদরের বাইরে পা দিতেই দেখি, ছোট তরফের রকে ছেলে-ছোকরাগুলো কেউ নেই। ছোট কর্তা রাঙা নতুন গামছা পরে দাঁড়িয়ে। ভারী হাসি-হাসি আহ্লাদি মুখ। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, আরে উপল ভায়া যে! তোমার তো দেখাই একদম পাই না। ভোল পালটে গেছে, অ্যাঁ! ভাল জামাকাপড়, চেহারাও দিব্যি ফনফন করছে! পেশকারি পেয়োচ নাকি, অ্যাঁ!

খুব হাসলেন। সম্পর্কে মামা হন, তবু বরাবরই ছোট তরফ ভায়া বলে ডাকেন আদর করে।

বললাম, ছোট মামা, ভাল আছেন তো!

বেশ আছি, বেশ আছি!

বলে এই গরমকালে নাইকুণ্ডলীতে আঙুল দিয়ে তেল ঠাসতে ঠাসতে অন্য হাতে আমাকে কাছে ডেকে গলা নামিয়ে বললেন, ও বাড়ির কী সব গণ্ডগোল শুনছি হ্যাঁ! ব্যাপারখানা কী জানো কিছু?

একটু গাড়ল সেজে বললাম, আমিও শুনছি। কে একটা মাস্তান ছেলে নাকি কেতকীকে বিয়ে করতে চাইছে।

ছোট কর্তা খুব গম্ভীর মুখে শুনে মাথা নেড়ে বললেন, আমিও পাড়ায় কানাঘুষো শুনছি। কী কেলেঙ্কারি বলো তো! তা দাদা বলছে-টলছে কী?

খুব ঘাবড়ে গেছেন।

ছোট কর্তা আহ্লাদের ভাবটা চেপে রাখতে পারলেন না। প্রায় হেসেই ফেললেন বলা যায়। মুখটা নামিয়ে বললেন, কেতকীর ভাবগতিক কিছু বুঝলে?

না।

ছোটবাবু একটা দুঃখের শ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ব্যাপার কি আর ঠেকানো যায়! আজকালকার ছোঁড়াছুঁড়িদের কারবার সব। আমি বলি কি উদ্যোগ-আয়োজন করে বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়! আজকাল আর বংশ-টংশ জাত-ফাত কে-ই বা মানছে। আমেরিকা ইউরোপে তো শুনি হরির লুট পড়ে গেছে। নিগ্রোয়, চিনেম্যানে, সাহেবে, হিন্দুতে একেবারে বিয়ের খিচুড়ি। এ দেশেও হাওয়া এসে গেছে। দাদাকে বুঝিয়ে বোলো, বংশ-টংশর মর্যাদা আঁকড়ে থাকলে আর চলবে না। ছেলেটাকে আমি মোটামুটি চিনি। খারাপ তেমন কিছুই নয়, একটু হাত-ফাত চালায় আর কী!

আমি বললাম, বলব।

ছোটবাবু একটু হেসে বললেন, তোমার তা হলে ভালই চলছে বলো! পোশাক-আশাক চেহারা দেখে এক ঝটকায় চিনতেই পারিনি। মানুষের উন্নতি দেখলে বড় আনন্দ হয়। করছ-টরছ কী আজকাল?

ওই টুকটাক।

খুব ভাল, খুব ভাল। দেখছ তো চারদিকে কেমন বেকারের বন্যা এসেছে! এই রকটাই এখন নিজের দখলে থাকে না, পাড়ার ছেলেছোকরা সব এসে বসে। তাড়াতেও পারি না। তাড়ালে যাবে কোথায়! তা এই বেকারের যুগে তোমার কিছু হয়েছে দেখে বড় খুশি হলুম ভায়া।

দু-চারটে কথা বলে কেটে আসি। বুঝতে পারি, ছোট তরফ লোক ভাল নয়, বড় তরফকে বেইজ্জত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ পাড়ায় ছোট তরফেরই হাঁকডাক

বেশি, তাঁর নিজের একটা ক্লাবও আছে।

কিন্তু ছোট তরফের দোষ দিয়ে কী হবে! আমিও কি লোক ভাল? তার চেয়ে দুনিয়ার ভাল-মন্দের ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়াই কাজের কাজ। ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে হাঁটছি। বুকের মধ্যে একটা বড় কষ্ট ঘনিয়ে উঠছে। কেতকীর কথাগুলো ট্রেসার বুলেটের মতো ছুটে আসছে বার বার। ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন হতে পারত। হল না। হয় না।

গলির তেমাথায় আঙুলহারা সমীরের সেই স্যাঙাত দাঁড়িয়ে ছিল। রোগা শুটকো চেহারা, লম্বা চুলে তেলহীন রুক্ষতা, মস্ত মোচ চিনেদের মতো ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, একটা কথা বলব?

ছেলেটা কানকি মেরে চেয়ে বলল, বলুন।

বললাম, বিয়ে-টিয়ের অনেক ঝামেলা। মেয়েটাও রাজি হচ্ছে না। তার চেয়ে ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটিয়ে ফেললে হয় না?

ছেলেটা অন্য দিকে চেয়ে বলল, বিয়ে কে চাইছে মসাই? ক্যাস ছাড়তে বলুন, সব মিটিয়ে নিচ্ছি।

নেবেন?

আলবত নেব। ক্যাস ছাড়লে আমরা কেতকীর বিয়েতে পিঁড়ি ঘুরিয়ে দিয়ে আসব। ওর বাপকে রাজি করান।

আমার সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় কাঁপছে। মাথার মধ্যে টিক টিক শব্দ। বললাম, সমীরবাবু ছাড়তে রাজি হবেন?

ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, সমীরের কি মেয়েছেলের অভাব পড়েছে নাকি! সামনে হাড়কাটা গলি থাকতে! ও সব ভড়কি দিচ্ছে। তবে আমরা দু'চারদিন ফুর্তি-টুর্তি করব, মাল-ফাল খাব, ফাংশান করব, তার জন্য দু'হাজার ছাড়তে বলুন। যদি রাজি না হয় তবে কেস সিরিয়াস হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে তো খুব রিলেটিভিটি আছে। দেখুন বলে।

আপনারা কি গিরিবাবুর কাছে টাকা চেয়েছিলেন?

না। টাকা চাইব কেন? গিরিবাবু আমাদের পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল, তাই সমীরের জেদ চেপে গেছে, এসবার-ওসপার করে দেবে। আমরা কেলো করতে চাই না। ও সব ভদ্রঘরের, শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে সমীর বরং আরও ফেঁসে যাবে, ওর ক্লাস এইট-এর বিদ্যে। অনেক বুঝিয়েছি সমীরকে। রাজি হচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি, ক্যাস পেলে ও কে ছেড়ে দেবে।

মাথার ভিতরটায় টাকড়ুমাড়ুম বাজছে। এক বার অস্ফুট দাঁড়ান বলে দৌড়ে ফিরে আসি। সদরে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বেরোচ্ছেন। খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে রাস্তাঘাট দেখে নিচ্ছেন, চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়ার আগে।

আমাকে দেখে বললেন, ফিরে এলে যে!

একটা জিনিস ফেলে গেছি।

উনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, অ। তা এসো নিয়ে, তোমার সঙ্গে বাসরাস্তা পর্যন্ত যাবখন।

মাসিকে গিয়ে বললাম, কেতকীকে বাঁচাতে চাও তো পাঁচশোটা টাকা গুনে এনে দাও। আমার গুনবারও সময় নেই।

মাসি মুহূর্তের মধ্যে এনে দিল। আমি পাখনা মেলে উড়ে বেরিয়ে এলাম। গিরিবাবু সঙ্গ নিলেন বটে, কিন্তু আমার দৌড়-হাঁটার সঙ্গে তাল দিতে না-পেরে পিছনে পড়ে রইলেন।

ছেলেটা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে ছিল। তার বুক পকেটে ঝট করে টাকাটা ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, বাকিটা সামনের সপ্তাহে।

ছেলেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আস্তে বলল, কত আছে?

পাঁচশো।

পলকের মধ্যে ছেলেটা ভীষণ বিনয়ি হয়ে বলল, গিরিবাবু দিলেন?

মানুষ চরিয়ে খাই। পলকের মধ্যে বুঝলাম, এক্ষুনি ঘটনার লাগাম নিজের হাতে ধরে ফেলতে হবে। গিরিবাবু টাকা দিয়েছে এমন কথা মিথ্যে করে বললে ওরা বড়বাবুকে পেয়ে বসবে। ফের টাকার দরকার হলে আবার ঝামেলা করবে। গম্ভীর হয়ে বললাম, না। আমিই দিচ্ছি। কিন্তু আর কোনও ঝামেলা হলে বাকি টাকাটা তো দেবই না, উলটে অন্য রকম ঝামেলা হয়ে যাবে।

ছেলেটা সদ্য টাকা খেয়েছে। যারা টাকা খায় তাদের ব্যক্তিত্ব থাকে না। ভাল-মন্দের জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। এ ছেলেটাও মাস্তানি ঝেড়ে ফেলে একটু খোশামুদে হাসি হেসে বলল, ঝামেলা হবে কেন? সমীর সালাকে আমরা টাইট দিচ্ছি। আপনি ডেফিনিট থাকুন।

গিরিবাবু পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন খুব তাড়াতাড়ি। ছেলেটা সেদিকে তাকালও না।

ছেলেটার আরও কয়েকজন সাঙাত এসে চারধারে দাঁড়িয়ে গেল। টাকার ব্যাপারটা আড়াল থেকে লক্ষ করে থাকবে। টাকার গন্ধ গোলাপ ফুলের মতো, যারা গন্ধ নিতে জানে তারা ঠিক গন্ধ পায়।

ছেলেটা সঙ্গীদের দিকে চোখ মেরে আমাকে বলল, তা হলে ফের সামনের সপ্তাহে, কেমন?

হ্যাঁ। কিন্তু ছোটবাবু কী হবে?

ছেলেটা মাথাটা সোজা রেখেই বলল, ছোটবাবু ফোতো কাপ্তান। দশ-বিশ চাক্কি ঝাঁক দিতেই আমাদের দম বেরিয়ে যায়। ওর মামলায় আমরা আর নেই। তবে ওর ছেলে সন্তু আমাদের দোস্ত, কিন্তু তাকে টাইট দেওয়ার ভার আমার। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান।

নিশ্চিন্ত হয়েই আমি বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি। নিজের ভিতরটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। টাকাটা চলে গেল হাত থেকে। সামনের সপ্তাহে আরও যাবে। যেন এই যাওয়ার জন্যই হুড়মুড় করে টাকাটা এসেছিল।

বাসরাস্তায় ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে বড়বাবু দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই প্রায় ছুটে এসে বললেন, চেনো নাকি ওদের?

চেনা হল। আপনি আর ভাববেন না বড় মামা, সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে এসেছি। আর কেউ হুজ্জত করবে না।

মিটে গেল মানে? কী করে মেটালে?

একটু মহৎ হতে ইচ্ছে করল। অনেককাল মহৎ হইনি। বললাম, সে শুনে আপনার কী হবে? তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আর কেউ কিছু করতে সাহস পাবে না।

বড়বাবু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে আছেন। এ কয়দিনে তার বয়স বহু বেড়ে গেছে, আয়ুক্ষয় হয়েছে অনেক। একটা বহুদিনকার চেপে রাখা শ্বাস হুস করে ছেড়ে বললেন, সত্যি বলছ উপল ভাগ্নে! তুমি কি হিপনোটিজম জানো?

জানি বড়মামা। হিমনোটিজম সবাই জানে। যাক গে, কেতকীর বিয়ের আর দেরি করবেন না। এই বেলা দিয়ে দিন।

কার সঙ্গে দেব? ওই হাতকাটা সমীরের সঙ্গে?

আরে না না।— হেসে ফেলে বলি, কলকবজা নেড়ে দিয়ে এসেছি বড়মামা, এখন আপনারা বিয়ে দিতে চাইলেও সমীর উলটো দৌড়ে পালাবে। তার কথা বলিনি। ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিন।

কিন্তু ছোট তরফ?

রা কাড়বে না।

ঠিক বলছ?

তিন সত্যি।

বড়বাবুর মন থেকে সন্দেহটা শতকরা আশিভাগ চলে গিয়েও বিশভাগ রইল। সেই তলানি সন্দেহটা মুখে ভাসিয়ে তুলে বললেন, ইঞ্জিনিয়ার ছেলে একটা হাতেই রয়েছে। বড্ড খাঁই তাদের। তা এখন আর সে সব ভেবে দেরি করলে হবে না দেখছি।

লাগিয়ে দিন।

যদি ভরসা দাও তো এ মাসেই লাগাব। কলকাতায় দুই দিনে বিয়ের জোগাড় হয়।

অন্যমনস্ক ও উদাস স্বরে ‘তাই করুন বড়মামা’ বলে বিনা ভূমিকায় হাঁটতে থাকি। টের পাই, বড়বাবুর চোখ আমাকে বহু দূর পর্যন্ত প্রচণ্ড বিস্ময়ে দেখতে থাকে।

অনেক দিন বাদে নিজেকে বেশ মহৎ লাগছে।

.

১২.

একটু আগে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। লেকের জলের ধারে ঘাসের ওপর বর্ষাতি পেতে চুপ করে বসে আছি। মেঘ ভেঙে অল্প রাঙা শেষবেলার রোদ উঠল ওই। ফ্যাকাসে গাছপালা যেন রূপকথার রাজ্যে জেগে উঠল হঠাৎ। জল উঠল ঝিলমিলিয়ে। জীবন এ রকম। কখনও মেঘ, কখনও রোদ।

ক্ষণা আসবে। আমার আর ক্ষণার মধ্যে এখন গোপনীয়তা তৈরি হয়েছে। যেন পাতালের নদী। বাড়ির বাইরে আমরা আজকাল লুকিয়ে দেখা করি।

ক্ষণার ভিতরে আজকাল আর-এক ক্ষণা জন্ম নিচ্ছে। সে অন্য এক রকম চোখে নিজেকেও দেখে আয়নায়। বেরোবার সময়ে ক্ষণা বলে দিয়েছিল, লেকে থেকো। আমি সিনেমার নাম করে বেরোব। পৌনে ছ’টায় দেখা হবে।

আমি জলে একটা ঢিল ছুড়ি। ঢেউ ভাঙে। কিছু ভাবি না। কিছু মনে পড়ে না। শুধু জানি, ক্ষণা আসবে। বর্ষাতির পকেটে লুকোনো টেপ-রেকর্ডার উন্মুখ হয়ে আছে।

ঘড়িতে পাঁচটা চল্লিশ। পিচের রাস্তাটা দ্রুত পায়ে পার হয়ে ক্ষণা ঘাসে পা দিয়েই হাসিমুখে ডাকল, এই।

পলকে মুখে হাসির মুখোশ পরে তাকিয়ে বলি, এসে গেছ?

দেরি করেছি? বলো!

না। একটুও না। বলে বর্ষাতিটা বড় করে পাতি। টেপ-রেকর্ডার চালু হয়।

ক্ষণা কাছ ঘেঁষে বসল। গায়ে গা ছোঁয়-ছোঁয়। বলল, ঠিক বেরোবার আধ ঘণ্টা আগে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি দেখে আমার যা কান্না পাচ্ছিল না! কখন থেকে তুমি এসে বসে আছ। আর আমি যদি বেরোতে না পারি!

খুব না-ভেবেই বলি, ঝড় বৃষ্টিতে কি কিছু আটকাত ক্ষণা? তোমাকে আসতেই হত।

ক্ষণা পাশমুখে আমার দিকে তাকায়। বড় প্রকট হয়ে আছে ওর আজকের সাজ। চোখের পাতায় আউটার আই ক্রিম লাগানো, কাজল, ম্যাসকারা, মুখে মেক-আপ, কপালে মস্ত টিপ, কানে ঝুমকো, চুল ফাঁপিয়ে আঁচড়ান, রেশমি বুটির দামি শাড়ি পরেছে কচি কলাপাতা রঙের। ঠোঁটে রক্ত-গাঢ় রং। আধবোজা মদির এক রকম চোখের দৃষ্টি খানিকক্ষণ ঢলে রইল আমার দিকে।

তারপর বলল, তুমি কী করে বুঝলে?

তারপর একটা ছোট্ট শাস ফেলে বলল, ঠিক। আমাকে আসতেই হত। কেন আসতে হত বলো তো!

কেন ক্ষণা?

ক্ষণা অকপটে চেয়ে থেকে বলল, তোমাকে ভালবাসি বলে।

সত্যিই ভালবাসো ক্ষণা?

কী করে বোঝাব বলো? সারা দিন কেবল তোমার কথা মনে আসে। সারা দিন। ঘুমিয়েও তোমার কথা ভাবি। ঘুম থেকে যেই চোখ মেলি অমনি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস করো।

আমার অবস্থা তোমার চেয়ে ভাল নয় ক্ষণা। আমার সমস্ত মাথা জুড়ে তুমি। শুধু তুমি।

শোনো।

উ!

ক্ষণা খুব কাছে ঘেঁষে আসে। ও বেহেড। সম্মোহিত। ওর চেতনা নেই যে, এখনও দিনের আলো ফটফট করছে। যে-কেউ, চেনা বা আধচেনা লোক আমাদের দেখে ফেলতে পারে। অবশ্য দেখে ফেললে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি। যত স্ক্যান্ডাল, তত পাবলিসিটি। যত পাবলিসিটি তত সুবিনয়ের সুবিধে। আমি এও জানি, আজ লেকে সুবিনয় সাক্ষী হিসেবে কয়েকজনকে হাজির রেখেছে। তারা কে আমি চিনি না। কিন্তু

আছে আশেপাশে। দেখছে। আমাকে আজ খুব ভাল অভিনয় করতে হবে।

ক্ষণা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, তুমি ছাড়া আর কেউ কখনও আমাকে এত সুন্দর দেখেনি। কখনও বলেনি, তুমি বড় সুন্দর।

তুমি সুন্দর ক্ষণা। বলে ক্ষণার কোমরের দিকে হাতটা আলতোভাবে জড়াই। বলি, সকলের কি সৌন্দর্য দেখবার চোখ থাকে?

ক্ষণা অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল একটু। তারপর বলল, তোমার বন্ধু কখনও আমাকে সুন্দর দেখে না। ও আমাকে দেখলই না ভাল করে, নিলও না। বিয়ের পর থেকেই দেখছি, ও বড় কাজের মানুষ। আমরা হানিমুনে যাইনি, এমনকী সিনেমা থিয়েটার বেড়ানো কিছু নয়। এই সেদিন প্রথম সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে এল না, তোমাকে পাঠাল। চিড়িয়াখানাতেও তাই। ও কেন এ রকম বলো তো!

গম্ভীর থেকে বলি, মহৎ মানুষরা ও রকমই হয় বোধহয়। আমি সে তুলনায় কত সামান্য।

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলল, না। তুমি সামান্য নও। যদি তাই হতে তো তোমাকে এত ভালবাসলাম কী করে? তোমার ভিতর একটা কী যেন আছে, ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু সুন্দর কী যেন আছে। তুমি নিজে বোঝো না?

অবাক হয়ে বলি, না তো!

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলল, আছে।

ফের একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, কিন্তু আমি অত কাজের মানুষ, মহৎ মানুষকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম কেন বলো তো! শুনি, ওর নাকি পৃথিবীজোড়া নাম। শুনে ভয় পাই। আমার তো অত বড় মানুষের বউ হওয়ার যোগ্যতা ছিল না! আমি আরও অনেক বেশি সাধারণ কারও বউ হলে কত ভাল হত বলো তো!

কথায় কথায় বেলা যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে। আজ বৃষ্টি বাদলা গেছে। লেক তাই বেশ নির্জন। আর এই ঘনায়মান অন্ধকার ও নির্জনতায় আমি ঠিকই টের পাই, আমাদের চারধারে ছায়া ছায়া কিছু মানুষ ঘোরাফেরা করছে। নজর রাখছে আমাদের দিকে। কারও হাতে কি ফ্ল্যাশগান লাগানো ক্যামেরা আছে? কথা ছিল, থাকবে।

ঝিরঝির একটু বৃষ্টি হেঁটে গেল চারপাশে। গাছের পাতায় পাতায় সঞ্চিত জলের বড় বড় ফোঁটা নামল। গ্রাহ্য করলাম না। ঘাস ছেড়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চে উঠে বসেছি দু'জনে, বর্ষাতিটা দু'জনের গায়ের ওপর বিছানো। বর্ষাতির নীচে আমাদের শরীর ভেপে উঠছে, ঘামছে।

ক্ষণা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওর তো দিল্লি থেকে ফেরার সময় হল।

আমিও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি, কী করবে ক্ষণা?

কী আর করব? যত যাই হোক, ওর ঘরই তো আমাকে করতে হবে!

শিউরে উঠে বলি, তা কেন ক্ষণা? আমি তোমাকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

ক্ষণা মাথা নেড়ে বলে, তা কি হয়?

কেন হবে না?

আমার ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে যে!

তাতে কী! নিজের জীবনটা কেন নষ্ট করবে? সুবিনয়ও দেখো একদিন বিদেশে বড় চাকরি পেয়ে চলে যাবে। আর আসবে না, খোঁজও করবে না। সেদিনের জন্য তৈরি থাকা ভাল ক্ষণা।

ক্ষণা আমার হাত ধরেই ছিল। সেই ধরা হাতটা একটু শক্ত হয়ে উঠল শুধু। ও বলল, তুমি কিছু শুনছ নাকি?

শুনেছি।

ক্ষণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আমারও কখনও কখনও ও রকম মনে হয়। মনে হয়, ও যেন বিদেশের মানুষ। মনে হয়, ও একদিন খুব দূরে সরে যাবে।

সময় থাকতে তুমি কেন সাবধান হচ্ছ না ক্ষণা? আমি— আমি তোমাকে ভালবাসি।

বলতে বলতেও আমার উৎকর্ণে কোনও একটা অস্পষ্ট কাশির শব্দ পৌঁছয়। সংকেত। আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমার অভ্যন্তরে ক্ষণার জন্য একটুকু ভালবাসা নেই। তৈরি হয়নি। তবু কাজটা আমাকে করতেই হবে।

বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ ক্ষণা। আমি ভাল এক্সপোজারের জন্য বর্ষাতিটা গা থেকে ফেলে দিই। তারপর গাছের ছায়ায় গভীর অন্ধকার নির্জনে ওকে জড়িয়ে ধরি। বাধা দেওয়ার কথা নয়। দিলও না ক্ষণা। আমার বিবেক এই অবস্থায় সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আড়াল থেকে তার ঘন ঘন কাশির আওয়াজ শুনতে পাই। আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য সে কয়েক বার তার বাদ্যযন্ত্রটা বাজাল। আমি পাত্তা দিলাম না। আমি ক্ষণাকে যথেষ্ট, যত দূর সম্ভব আবেগে চুমু খাই। কষ্টকর, ভয়ের চুমু। আমি তো জানি আমরা একা নই। জানি, ক্ষণার স্বামীও দৃশ্যটা দেখছে। বড় বিস্বাদ চুমু। তবু ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে অপেক্ষা করছি ফ্ল্যাশগানের ঝলকটার জন্য। অপেক্ষা করছি। অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছে।

চমকাল। ফ্ল্যাশের আলো নীল বিদ্যুতের মতো ঝলসে দিয়ে গেল আমাদের। পর পর দুবার।

ক্ষণা চমকে চোখ চেয়ে বলে, কী গো?

বিদ্যুৎ।

ও।

আবার সংলগ্ন হই। দক্ষ লোকদের হাতে ক্যামেরা আরও একটু পর পর চমকে চমকে উঠল।

তটস্থ ক্ষণা সোজা হয়ে বসে বলে, কে টর্চ ফেলছে?

টর্চ নয় ক্ষণা। আকাশে মেঘ চমকাল।

ক্ষণা আমার দিকে চেয়ে অন্ধকারে একটু চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ বলে, শোনো, মনে হচ্ছে কারা যেন লুকিয়ে থেকে দেখছে আমাদের।

আমার টেপরেকর্ডারের ক্যাসেট শেষ হয়ে আসছে। আমি হঠাৎ ওকে কাছে টেনে বলি, কেউ নয়। লেক হচ্ছে মুক্ত অঞ্চল, সবাই প্রেম করতে আসে। কে কাকে দেখবে? শোনো ক্ষণা, তুমি সুবিনয়কে ডিভোর্স করবে?

ক্ষণা নিজের চুল ঠিক করছিল। একটু চনমনে হয়ে চার দিকে তাকাচ্ছে। বিপদ। আমি ওকে টেনে নিই কাছে। ও বাধা দেয় না। বরং চোখ বুজে থাকে। অস্ফুট গলায় বলে, আমাকে বহুকাল কেউ আদর করে না উপল। একটু আদরের জন্য আমার ভিতরটা মরুভূমি হয়ে থাকে।

আমার রেকর্ডারের ফিতে ফুরিয়ে আসছে। সময় নেই।

বলি, বলো ক্ষণা, সুবিনয়কে ডিভোর্স করবে?

তেমনি অস্ফুট গলায় ও বলে, তুমি কি আমাকে একেবারে চাও?

চাই।

ভালবাসবে আমাকে চিরকাল?

বাসব ক্ষণা। বললা, ডিভোর্স করবে?

ও যদি বাধা দেয়! যদি মারে তোমাকে?

মারবে না ক্ষণা। ও আমাকে ভয় পায়। বাধা ও দেবে না।

ঠিক জানো?

হ্যাঁ।

আমার ছেলেমেয়ে কার কাছে থাকবে?

আমাদের কাছে।

তা হলে করব ডিভোর্স।

কথা দিলে?

দিলাম।

আদরের ছলে আমি ওকে ফের চুমু খেতে খেতে শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসি। অন্য হাতে ওর চোখ চেপে রেখে বলি, দেখো না। আমাকে দেখো না।

সামনে থেকে, পিছন থেকে, পাশ থেকে আরও তিন বার ক্যামেরার আলো ঝলসায়। অন্ধকারে ছায়া-ছায়া মূর্তি ঝোপের আড়ালে সরে যায়। আবার অন্য দুটো ছায়া দৌড়ে এক ধার থেকে অন্য ধারে সরে গেল। ফ্ল্যাশ চমকাল ফের। ক্ষণার শরীরের ঠিক কোথায় আমার হাত রয়েছে তার নির্ভুল ছবি তুলে নিল।

ক্ষণা বলল, চোখ ছাড়ো। কী করছ?

আমার সর্বাঙ্গে ঘাম। বুকের ভিতরে অসম্ভব দাপাদাপি। হাত-পা অবসাদে খিল ধরে আসে। বর্ষাতির পকেটে টেপ-রেকর্ডার থেমে গেছে। ক্যাসেট শেষ।

আমি দাঁড়িয়ে বললাম, চলো ক্ষণা।

বোসো আর-একটু। আমার তো সিনেমার শো ভাঙার পরে ফিরলেও চলবে। কী সুন্দর দিন ছিল আজ, ফুরিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

লজ্জা, ভয়, ক্লান্তি ও অনিচ্ছায় আমার মাথাটা বেভুল লাগে। আর বসে থাকার মানে হয় না। ক্লান্তির বোঝা বাড়বে কেবল।

তবু অনিচ্ছায় বসে থাকতে হয়।

ক্ষণা বলল, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো। আমাকে, দোলনাকে, ঘুপটুকে। ওরা তো অবোধ।

আমার ভিতরকার অনিচ্ছার ভাবটা ঠেলে আসে গলায়। বমির মতো। আমি যতটুকু করার করেছি। টেপ শেষ হয়ে গেছে। ক্যামেরা নিয়ে সরে গেছে লোকজন। এখন আর প্রেমের কথা আসে না। ফাঁকা লাগে, নিরর্থক লাগে।

.

রাত্রে সুবিনয় টেপ শুনছিল। তেমনি আধখানা ছায়া, আধখানা আলোয় পাথুরে মুখ দেখা যাচ্ছে। তবে ওর মুখে আজকাল অনেকগুলি নতুন গভীর রেখা পড়েছে। টেপ শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ঘাড় এলিয়ে দিচ্ছে। আবার সোজা হয়ে বসছে কখনও। অস্থির। সিগারেট খানিক খেয়েই প্রায় আস্ত গুজে দিচ্ছে আশট্রেতে।

আস্তে আস্তে ঘুরে টেপ শেষ হয়। সুবিনয় নিঃশব্দে উঠে ওয়াল ক্যাবিনেট খুলে নীট হুইস্কি ঢক ঢক করে জলের মতো তিন-চার ঢোক খেয়ে একটা হেঁচকি তুলল।

খুব আস্তে মড়ার মতো একখানা মুখ ফেরাল আমার দিকে। দু'চোখে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। যেন বা ভয়।

খুব আস্তে করে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি? ইউ আর এ বর্ন লেডি-কিলার। এ ডেমন! এ ড্রাগন!

চুপ করে থাকি। সুবিনয়ের দিক থেকে একটা মস্ত মোটা আর ভারী নোটের বান্ডিল উড়ে এসে কোলে পড়ল।

ফাইভ থাউজ্যান্ড। ইউ হ্যাভ আর্নড ইট।

এ কথা যখন বলছিল সুবিনয় তখন ওর গলায় কোনও আত্মবিশ্বাস ছিল না। ভয় পাওয়া মানুষের মতো গলা।

মাথা নিচু করে টাকাটার দিকে চেয়ে থাকি। অনেক টাকা। দারিদ্র্যের মুক্তিপণ।

সুবিনয় জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। আমার দিকে চাইছে না। সেইভাবেই থেকে বলল, আই ডোন্ট বিলিভ ইট। ইয়েট দি ইম্পসিবল হ্যাজ হ্যাপেনড বাডি।

আমি টাকা থেকে মুখ তুললাম।

সুবিনয় এসে সোফায় তার প্রিয় চিতপাত ভঙ্গিতে বসল। নিজের সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বলল, আমার ধারণা ছিল, ক্ষণা আমার সঙ্গে পুলটিশের মতো সেঁটে গেছে। কখনও ওকে সরানো যাবে না। অ্যাডামেন্ট ওয়াইফ।

হুইস্কির আধ গেলাস টেনে নিয়ে তীব্র অ্যালকোহলের যন্ত্রণায় গলা চেপে বুম হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আলোছায়াময় মুখ তুলে অদ্ভুত হেসে বলল, ইউ হ্যাভ ডান ইট বাডি। কংগ্রাচুলেশনস।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। যখন দরজার কাছ বরাবর পৌঁছে গেছি তখন ও ডেকে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি, ইউ আর ইন লাভ উইথ হার। গোয়িং টু ম্যারি হার বাডি, হোয়েন আ'ল বি অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার?

আমি চুপ করে রইলাম। তারপর মাথা নাড়ালাম। না।

লাভ হার বাডি। প্লিজ।

আমি ওর দিকে তাকালাম। স্পষ্ট টের পাই, আমার চোখ বাঘের মতো জ্বলছে। সমস্ত গায়ে শিরশির করে উঠছে রাগ। কিন্তু মাতাল সুবিনয় আমাকে লক্ষই করল না। বলল, আই অ্যাম গোয়িং হোম টুনাইট। ওয়েট বাডি, আই ক্যান টেক ইউ হোম।

.

রাতে আমি ফের বারান্দায় শুয়েছি। প্যাকিং বাক্সগুলি একটু নড়বড় করে বিছানাটা বড্ড শক্ত আর স্যাঁতস্যাঁতে ঠেকে। এ সবই ক'দিন সুবিনয়ের পুরু গভীর বিছানায় শোওয়ার অভ্যাসের ফল। শুয়ে জেগে থাকি। সুবিনয়ের ঘর থেকে কোনও শব্দ আসে না। ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখি। ক্ষয়া একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। বড় ভাল লাগে। চেয়ে থাকি। ভিতরটা বিস্বাদে ভরে আছে। চাঁদ বড় ভাল লাগে। চাঁদ কোনও কাজে লাগে না, ব্যবহার হয় না। শুধু অকারণে আকাশে ঝুলে থাকে। চাঁদ তাই বড় ভাল।

বুড়ো বিবেক আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, পাপ হল লঙ্কার মতো। যেমন ঝাল তেমনি স্বাদ। না উপল?

হ্যাঁ বিবেকবাবা।

কাঁদছ নাকি?

না বিবেকবাবা। চেষ্টা করে দেখেছি, আজকাল কান্না আসে না।

বিবেক শ্বাস ফেলে বলে, কাঁদলে ভাল লাগত।

জানি। কিন্তু সব সময়ে কি আসে?

বিবেক শ্বাস ফেলে বলে, পেটে অম্বল জমলে যেমন বমি করলে আরাম হয়, কান্নাও তেমনি। তোমার কোনও দুঃখের কথা মনে পড়ে না? কিছু একটা মনে করে দেখো। কান্না এসে যাবেখন।

আসে না। আমি মাথা নেড়ে বলি, অনেক দিন বাদে এই প্রথম একটা কাজ আমি শেষ করেছি বিবেকবাবা। মেলা ঝামেলা কোরো না। তুমি যাও।

বিবেক চলে যায়।

সে যেতে না যেতেই ছুঁচোর চিড়িক ডাক আসে অন্ধকার বারান্দার কোথা থেকে যেন।

চমকে উঠে বসি। বহুকাল কি ছুঁচোটা আসেনি? না কি আমিই লক্ষ করিনি ওকে, নিজের অন্যমনস্কতায় ডুবেছিলাম বলে ওর ডাক কানে আসেনি?

চকিতে মনে পড়ল, বিষ আনতে বার বার ভুল হয় বলে ক্ষণা আজ নিজেই কিনে এনেছে। শোওয়ার আগে আটার গুলিতে বিষ মাখিয়ে বারান্দায় আর বাথরুমে ছড়াচ্ছিল। আর তখন একবার আমার খুব কাছে এসে চাপা স্বরে বলেছিল, ও এসেছে। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কী করে যে আর একটা রাতও থাকব! পারছি না, একদম পারছি না। তুমি আমার কী করলে বলো তো! আমি কি নষ্ট হয়ে গেলাম? এ কি ভাল হল?

আমি উঠে বাতি জ্বালি। মুখ ধোওয়ার বেসিনের নীচে এঁটো বাসনের ওপর ছুঁচোটা তুরতুর করছে। আমাকে দেখে মুখ তুলল। দুটো চোখ আলোয় আলোময়। ওর অল্প দূরেই সেই বিষ মাখানো আটার গুলি। আমি নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিই।

লোভে আমার পায়ের কাছে ছুটে আসে ছুঁচোটা। করুণ মুখ তুলে যেন বলে, দাও। বড় খিদে।

আমি তাকে পাত্তা দিই না। তড়িৎগতিতে আমি বারান্দা আর বাথরুম থেকে আটার গুলি তুলে নিতে থাকি। ছুঁচোটা আমাকে আর ভয় পায় না। পায়ে পায়ে ঘোরে আর ডাকে। চিড়িক স্বরে যেন বলে, দাও। আমার বড় খিদে। আমাদের দর্শন-বিজ্ঞান নেই, সুখ-দুঃখ নেই, প্রেম-ভালবাসা নেই। আছে শুধু খিদে দাও।

আমি হাঁটু গেড়ে তার মুখোমুখি বসে বলি, আমিও কি নই তোমাদের মতো? সব কিছু খেতে নেই। আমারও চারধারে কত বিষ মাখানো খাবার ছড়িয়ে রেখেছে কে যেন। মাঝে মাঝে খেয়ে ফেলি। বড় জ্বালা।

.

১৩.

সুবিনয় অফিসে গেল। ক্ষণা গেল মার্কেটিং-এ। সুবিনয়ের মা কুসুমকে নিয়ে কালীঘাটে।

আমি বাথরুমে বসে নিবিষ্ট মনে গেঞ্জি কাচছিলাম। আজকাল ক্ষণা কাচাকাচি করতে দেখলে রাগ করে বলে, তুমি কাচবে কেন? কুসুম দেবে’খন। না হয় তো আমি দেব। পুরুষ মানুষের কাজ নাকি এ সব!

গেঞ্জি কাচা আমার খুব পছন্দের কাজ নয়। কিন্তু ভাবি, সারা জীবন আমাকেই তো কাচতে হবে। আমার তো কোনও দিন বউ হবে না। মধু গুপ্ত লেনের রুস্তমদের টাকা

আমি মিটিয়ে দেব। কেতকীর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। সেই ইঞ্জিনিয়ার। তাই ভাবি, এত কাল পর কেন এই আদরটুকু নিই? আমার এমনিই যাবে।

বাথরুমের দরজায় কে এসে দাঁড়াল। প্রথমে তাকাইনি। কিন্তু নিথর এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে টের পেয়ে চোখ তুলেই চমকে উঠি।

প্রীতি — আমার গলার স্বর কেঁপে যায়।

সাদা খোলের চওড়া জরিপেড়ে একটা ভীষণ দামি শাড়ি পরনে। ওর মুখও সাদা। ঠোঁট ফ্যাকাসে। খুব বিষন্ন দেখাচ্ছিল।

ও চৌকাঠের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কাছেই এসেছি।

আমার কাছে?

উপলবাবু, ক্ষণাদিকে নষ্ট করলেন?

আমি মাথা নিচু করে বলি, না তো। আমি ওকে ভালবাসি।

প্রীতি জলময় নোংরা চৌকাঠের ওপর সাদা শাড়ির কথা ভুলে গিয়ে বসে পড়ল ঝুপ করে। ঠিক আমার চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল।

কী হল?–আমি অবাক হয়ে বলি।

আমি সব জানি উপলবাবু।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, মাইরি।

বেচারা! প্রীতি হেসে বলে, না, ক্ষণাদিকে নয়, আপনি বড় বেশি টাকা ভালবাসেন।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। আমি টাকা ভালবাসি না। আমি শুধু চেয়েছিলাম টাকা সহজলভ্য হোক! বৃষ্টির মতো, জলপ্রপাতের মতো টাকা ঝরে পড়ুক। হ্যান্ডবিলের মতো টাকা বিলি হোক রাস্তায় রাস্তায়।

তাই টাকার জন্য আমার দিদিকে নষ্ট করলেন?

নষ্ট?

বলে আমি অবাক হয়ে তাকাই। তারপর প্রীতির কাছে হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, দেখুন। আমার মুখের মধ্যে দেখুন।

এই বলে হাঁ করে থাকি।

প্রীতি আমাকে পাগল ভেবে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী দেখব?

দেখলেন না আমার মুখের মধ্যে?

কী?

বিশ্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে। আপনিও ভাল করে দেখলে দেখতে পেতেন, আমি কাউকে নষ্ট করিনি। যে যার কর্মফলে নষ্ট হয়ে আছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।

লোকে যেমন রাস্তার পাশে পচা ইঁদুর দেখে তেমনি একরকম ঘেন্নার চোখে আমাকে দেখছিল প্রীতি। অনেকক্ষণ দেখে বলল, আপনি অন্য কোথাও যেতে চান না উপলবাবু?

গেঞ্জিটা ধুয়ে নিংড়ে আমি উঠে আসি। হেসে বলি, যাব। আমাকে তো যেতেই হবে। প্রীতি, জীবনে এই প্রথম একটা কাজ আমি সম্পূর্ণ করেছি। এই আনন্দটা আমাকে কিছুক্ষণ উপভোগ করতে দিন।

কী কাজ?

ক্ষণাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। এবার আপনারা আমেরিকা চলে যেতে পারবেন।

বেচারা!– প্রীতির দীর্ঘশ্বাস ফাঁকা বাড়িতে বড় করে শোনাল। বলল, আপনি কি ভাবেন, যে লোকটা তার বউকে স্ক্যান্ডালে জড়ানোর জন্য এত কাণ্ড করছে তাকে আমি বিশ্বাস করব? ক্ষণাদিকে আমরা ছেলেবেলা থেকে জানি। চিরকাল ওর ঘর-সংসারের দিকে ঝোঁক। এমন গুছিয়ে পুতুল খেলত যে সবাই বলত, ও খুব সংসার-গোছানি মেয়ে হবে। তাই হয়েছিল ক্ষণাদি। স্বামী, শাশুড়ি, বাচ্চা সংসার নিয়ে কেমন জড়িয়ে গিয়েছিল। অমন ভাল বউকে কেউ এত নীচে টেনে নামায়?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

প্রীতি আমার একটা হাতে হাত রেখে বলল, কেন করলেন এমন? কী দিয়ে ভোলালেন ক্ষণাদিকে?

উদাস স্বরে বলি, আমি নিমিত্ত মাত্র। যা হওয়ার তা হয়েই ছিল।

প্রীতি আরও এক পা কাছে সরে এসে বলল, কিছু হয়নি উপলবাবু। জামাইবাবুকে আমি নিইনি মনের মধ্যে। কখনও হয়তো কোনও দুর্বলতা এসেছিল, এখন নেই। আপনি দিদিকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায় প্রীতি?

আপনাকে আমার ভীষণ দরকার।

কেন প্রীতি?

বলব। আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

গোছানোর মতো কিছু নেই।

তা হলে চলুন।

আমি পোশাক পরে নিই। টাকার মস্ত বান্ডিলটা পকেটে পুরি।

প্রীতি আড়চোখে দেখে বলল, কত টাকা!

অনেক।

প্রীতি চেয়ে রইল আমার দিকে। করুণাঘন চোখ।

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিল প্রীতি। উঠতে গিয়েই চমকে উঠে দেখি, রুমা বসে আছে। পিছনের সিটে হেলে বসে নিজের বাঁ হাতের নখগুলো দেখছিল। আমার দিকে খরচোখে একবার তাকাল। প্রীতিকে বলল, ওঁকে সব বলেছ প্রীতি?

না। তুমি বলো।

বলছি।

বলে রুমা সিটের মাঝখানে সরে এসে বসল। এক ধারে প্রীতি, অন্য ধারে আমি।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালা ধীরগতিতে গাড়ি চালায়। হয়তো তাকে ও রকমই নির্দেশ দেওয়া আছে।

রুমা পাশে বসতেই আমার শরীরে একটা কাঠের মতো শক্ত ভাব দেখা দিল। বুকে ভয়। নার্ভাস লাগছে।

রুমা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, শুনুন রোমিও, প্রীতি অবশেষে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

আমি অনেকখানি বাতাস গিলে ফেলি।

আমাকে?

আপনাকে। কেন, আপনি রাজি নন?

উদভ্রান্তের মতো বলি, কী বলছেন? আমি কি ঠিক শুনছি?

ঠিকই শুনছেন। প্রীতি আপনাকে বিয়ে করতে চাইছে। আজই এক্ষুনি। অনেক স্যুটারের ভিতর থেকে প্রীতি আপনাকেই বেছে নিয়েছে। আপনি ভাগ্যবান।

মাথাটা ঘুলিয়ে ওঠে। কিছু বুঝতে পারি না। পাঞ্জাবি ট্যাক্সি ড্রাইভারের সবুজ পাগড়ির দিকে চেয়ে থাকি। আমার শরীরের কোথায় যেন একটা বৈদ্যুতিক তার ছুঁয়ে আছে। মৃদু শিহরনে শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। নতুন এক চোখে প্রীতির দিকে পাশ ফিরে চাইলাম।

প্রীতি আমার দিকে চেয়ে ছিল, চোখ চোখ পড়তেই মুখখানা ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

গোলপার্কে ওদের ফ্ল্যাটে এসে রুমা বলল, আমি পাশের ঘরে আছি প্রীতি। তোমরা কথা বলে নাও।

রুমা তার ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকানি দিয়ে দিল। তারপর ও ঘর থেকে সেই ট্যাংগো নাচের বাজনা আসতে লাগল।

তার সেই ঘোরানো চেয়ারে প্রীতি মাথা নত করে বসে আছে। কার্ল করা খাটো চুলের রাশি থোপা থোপা কালো আঙুরের মতো ঘিরে আছে মুখখানা।

গদি-আঁটা টুলের ওপর হতভম্ব মাথা নিয়ে বসে আছি। কথা আসছে না।

অনেকক্ষণ বাদে প্রতি তার সুন্দর কিন্তু ফ্যাকাসে মুখখানা তুলে আমার দিকে ফেরাল। নরম আদরের গলায় ডাকল, উপল!

উ।

আমাকে বিয়ে করবে না উপল?

মাথা নেড়ে বললাম, আমি কি স্বপ্ন দেখছি প্রীতি?

না।–প্রীতি মাথা নেড়ে বলল, শোনো উপল, তোমাকে ছাড়া আমার উপায় নেই।

চোখের জল মুছে নিয়ে বললাম, আমাকে কেউ ভালবাসে না প্রীতি।

প্রীতি আবার কালো আঙুরের থোপায় মুখ ঢেকে মাথা নত করে মৃদু স্বরে বলল, আমি বাসি।

কবে থেকে প্রীতি?

যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম। জামাইবাবুর পাগলামির চিঠি নিয়ে এসেছিলে। আমি তোমার ওপর বিরক্ত হয়েছিলাম উপল। কিন্তু তখন থেকেই তোমাকে ভুলতে পারি না। কেন ভুলতে পারি না তা অনেক বার ভেবে দেখেছি, বিরক্ত হয়েছি নিজের ওপর।

পরে বুঝতে পেরেছি, তোমাকে আমি কবে থেকে যেন ভালবেসে ফেলেছি! বুঝে নিজের ওপর রেগে গেছি। কিন্তু ভালবাসার ওপর কি কারও হাত থাকে, বলো!

প্রীতি, আমি সামান্য মানুষ।

কে বলল উপল? তুমি সামান্য নও। তোমার ভিতরে কী আছে তা তুমি কোনও দিন বুঝতে পারোনি।

কী আছে প্রীতি?

নতমুখী প্রীতি বলে, তুমি বড় ভাল লোক। তুমি খুব ভাল।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না প্রীতি। আমি ভাল নই। আমার যখন খিদে পায় তখন আমার মাথার ঠিক থাকে না। তখন মানুষ আমাকে যা করতে বলে তাই করি। বরাবর মানুষ আমাকে নিমিত্তের ভাগী করেছে প্রীতি। কিন্তু যদি খিদে না পেত–

সজল, বিশাল দুখানা চোখে প্রীতি আমার দিকে তাকায়। তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। কথা ফোটে না প্রথমে। তারপর খুব অন্য রকম এক গলায় আস্তে করে বলে, আমি তোমাকে খাওয়াব উপল। আমি তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাব। দুজনে মিলে খাটব, খাব। খিদের কথা বোলো না। আমার বড় কষ্ট হয়।

অবাক হয়ে বলি, আমেরিকায় নিয়ে যাবে?

ও মাথা নেড়ে বলল, নিয়ে যাব। আমি সামনের রবিবারে চলে যাচ্ছি। গিয়েই তোমার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করব। ভেবো না, সে দেশে কখনও খাবারের অভাব হয় না।

নিয়ে যাবে! আমার রক্তে রক্তে ট্যাংগো নাচের বাজনা ঢুকে যায়। আমার ভিতরে যেন এক নাচঘর তৈরি হয়ে গেল। সেই ঘরে জোড়া জোড়া পা ফেলে সাহেব-মেম নেচে বেড়াচ্ছে।

প্রীতি!

প্রীতি উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনবার চেষ্টা করছিল। জবাব দিল, উ!

কবে আমাদের বিয়ে হবে?

আজ। বেলা তিনটের সময় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আসবেন, সাক্ষীরা আসবেন।

আমি হাসলাম। বহুকাল এমন গাড়লের মতো হাসিনি।

প্রীতি, শোনো। বিয়ের পর আমরা জোড়ে মাসির কাছে যাব।

প্রীতি অবাক হয়ে বলে, মাসি কে?

আমার এক মাসি আছে। মাসি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। বড় খুশি হবে মাসি। কত আদর করবে তোমাকে, দেখো। যাবে তো!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব উপল।

তুমি মাসিকে প্রণাম করবে তো প্রীতি?

করব, নিশ্চয়ই করব।

কটা বাজে প্রীতি?

প্রীতি মৃদু হেসে বলে, তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট। তুমি ঘাবড়ে যাওনি তো উপল?

অবাক হয়ে বলি, না তো! ঘাবড়াব কেন? আমার অসম্ভব, অসহ্য এক আনন্দ হচ্ছে। প্রীতি, তুমি বিয়ের পর সিঁদুর পরবে তো?

প্রীতি করুণ মুখখানা তুলে বলে, পরতে তো হবেই।

শাঁখা?

তাও।-বলে প্রীতি হাসল। বড় সুন্দর হাসি।

তুমি কি রাঁধতে পারো প্রীতিসোনা?

প্রীতি ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ। আমি অনেক রকম রান্না জানি। দেশি, বিলিতি। আমেরিকায় তো আমাকেই রাঁধতে হবে তোমার জন্য।

কেন প্রীতি? আমরা রান্নার লোক রাখব।

ওদের দেশে ভীষণ টাকা লাগে লোক রাখতে।

লাগুক। তোমাকে আমি তা বলে রাঁধতে দেব না।

আচ্ছা। বলে প্রীতি চোখে চোখে একটু হাসে।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ উঠে আসছে। উত্তেজনায় কেঁপে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি।

প্রীতিও উঠে দাঁড়ায়। ম্লান মুখ করে বলে, ওরা আসছে।

আমি আজ দাড়ি কামাইনি প্রীতি।–গালে হাত বুলিয়ে বলি।

তাতে কিছু হবে না উপল। সারা জীবন তো কামাবেই।

সাজিনি।

তোমাকে অনেক পোশাক করে দেব।

তিনজন লোক ঘরে এসে দাঁড়ায়। একজনের হাতে খাতাপত্র। প্রথমে উত্তেজনার বশে আমি তাদের মুখ ভাল করে দেখতে পাই না। তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়, তিনজনের মধ্যে একজন প্রীতির সেই প্রেমিক।

প্রীতি আমার কাছে ঘেঁষে এসেছিল। ওর একটা হাত কখন আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আমি ফিস ফিস করে বলি, ও কে প্রীতি? ও কেন এখানে?

প্রীতি মৃদু স্বরে বলে, ও আমার কেউ না উপল। ও শুধু সাক্ষী দিতে এসেছে।

পাশের ঘরে ট্যাংগো থামল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল রুমা। খাতা হাতে লোকটা চেয়ার টেবিলে গিয়ে বসল। প্রীতির প্রাক্তন প্রেমিক আর একজন অচেনা লোক গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

থমথম করছে ঘর। কেউ কোনও আনন্দ করছে না। এই শোকের ছায়ার মধ্যে কী করে বিয়ে হবে?

প্রীতি আমার হাত চেপে ধরে বলল, এসো উপল।

আমি বললাম, কেউ উলু দিল না প্রীতি, শাঁখ বাজল না।

প্রীতি আমাকে টেবিলের সামনে নিয়ে গেল। ম্যারেজ রেজিস্টার আঙুল দিয়ে ফর্মে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এইখানে সই করুন।

একদম সময় লাগল না। আমি আর প্রীতি সই করার পর রুমা, প্রীতির ভূতপূর্ব প্রেমিক আর অচেনা লোকটা সই করল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তার খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠল। চলে গেল।

প্রীতি তার ঘোরানো চেয়ারে বসে আছে। নতমুখ। কালো আঙুরের থোপায় ঘিরে আছে মুখখানা। হঠাৎ ও একটু কেঁপে উঠল। চাপা কান্নার একটা অস্ফুট শব্দ কানে এল। ঘরের মাঝখান থেকে আমি ছুটে ওর কাছে যাওয়ার জন্য এগোতেই মাঝখানে রুমা এসে দাঁড়াল।

উপলবাবু! ওকে এখন আর ডিস্টার্ব করবেন না।

ডিস্টার্ব!–আমি ভীষণ অবাক হয়ে বলি, ডিস্টার্ব মানে? ও আমার বউ। আমার বউ কাঁদছে কেন সেটা আমার জানা দরকার।

রুমার দু'পাশে প্রীতির প্রাক্তন প্রেমিক আর অচেনা লোকটাও এসে দাঁড়াল। করুণ

চোখে আমার দিকে চেয়ে প্রেমিকটি বলল, সে তো ঠিকই উপলবাবু। ও তো চিরকালের মতোই আপনার হয়ে গেল। এখন ওকে একটু রেস্ট নিতে দিন।

তীব্র আকুলতায় আমি বললাম, আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। আমার বউ কাঁদছে।

রুমা অত্যন্ত উদাস গলায় বলল, উপলবাবু, এখনও ও কেবলমাত্র কাগজের বউ। সেটাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

ভীষণ অবাক হয়ে বলি, কাগজের বউ! তার মানে?

কাগজে সই করা বউ। রুমা নিষ্ঠুর গলায় বলে, তার বেশি নয়।

আমি গাড়লের মতো তাকিয়ে থাকি। তিনজন মানুষ আমার সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওপাশে প্রীতি তার টেবিলে মাথা রেখে কাঁদে অঝোরে।

প্রীতি!– আমি প্রাণপণে ডাকি।

প্রীতি উত্তর দেয় না। কাঁদতে থাকে।

প্রেমিক আমার হাত ধরে বলে, ইমোশনাল হবেন না উপলবাবু। এখন আপনার অনেক দায়িত্ব।

আমি মাথা নেড়ে বলি, ঠিকই তো। আমি বিয়ে করেছি, দায়িত্ব হওয়ারই কথা।

প্রাক্তন প্রেমিক মাথা নেড়ে বলে, সেইজন্যই তো বলছি। দেয়ার আর মাচ টু বি ডান। এখন আপনার প্রথম কাজ সুবিনয়বাবুকে খবরটা পৌছে দেওয়া। ওকে জানিয়ে দেবেন, প্রীতির সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। এ কাজটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট উপলবাবু।

আমি বুঝতে পারি না। সব ধোঁয়াটে লাগে। তবু মাথা ঝাঁকাই। চিরকাল লোকে আমাকে এটা-সেটা ভালমন্দ কাজ করতে বলেছে। আমি করে গেছি।

প্রাক্তন প্রেমিক বলল, কেন ইম্পর্ট্যান্ট জানেন? সুবিনয়বাবুর পাগলামি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে গেছে। উনি সব সময়ে প্রীতিকে গার্ড দিচ্ছেন। অথচ পরশুদিন প্রীতিকে ফ্লাই করতেই হবে।

পরশুদিন!–আমি চমকে উঠে বলি।

পরশুদিন রবিবার। প্রীতির প্যাসেজ বুকড হয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, আজ কী বার?

শুক্রবার – উপলবাবু, শুনুন, সুবিনয়বাবুকে বলবেন, প্রীতির সঙ্গে কোনও রকম ঝামেলা করলে আমরা পুলিশের প্রোটেকশন নেব। প্রীতি এখন একজনের লিগাল

ওয়াইফ।

একজনের নয়। আমি মাথা নাড়ি। একজন কথাটা আমার পছন্দ হয় না। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলি, প্রীতি আমার বউ।

পেপার ওয়াইফ।–রুমা তীব্র গলায় বলল।

না না।–প্রেমিক বলে ওঠে, উপলবাবু ঠিকই বলছেন। প্রীতি এখন উপলবাবুরই স্ত্রী।

প্রীতি টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। অঝোর কান্না। আমার বুকের মধ্যে ঢেউ দুলে ওঠে। আমার সামনে তিনজন মানুষ দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমি বলি, একবার আপনারা আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। ও আমার বউ। আমার বউ কাঁদছে।

প্রাক্তন প্রেমিক বলে, ওকে কাঁদতে দিন। ও আনন্দে কাঁদছে। এবার কাজের কথা শুনুন উপলবাবু, সুবিনয়কে আপনি এই ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা দেখাবেন। ফেস হিম লাইক এ হিরো। মনে রাখবেন, আপনি আপনার স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য লড়ছেন।

আমি বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলি, বুঝেছি। সুবিনয় কিছু করবে না। ও আমাকে ভয় পায়।

বলে আমি হাসতে থাকি।

প্রাক্তন প্রেমিক বলে, সেটা আমরা জানি উপলবাবু। সুবিনয় আপনাকে ভয় পায়। কারণ, আপনি ওর অনেক গোপন কথা জানেন। আর ঠিক সেই কারণেই আপনাকে এ কাজের জন্য চুজ করা হয়েছে।

চুজ করা হয়েছে। আমি বাতাস গিলে বলি, তার মানে?

স্লিপ অফ টাং মাই ডিয়ার। প্রাক্তন প্রেমিক একটু হেসে বলল, ডোন্ট মাইন্ড। কাজের কথাটা শুনে নিন। আপনি সুবিনয়কে আরও বলবেন যে, প্রীতি পরশু দিন আমেরিকা যাচ্ছে না। তার বদলে আপনি কাল প্রীতিকে নিয়ে হানিমুনে যাচ্ছেন। কুলু ভ্যালিতে।

কুলু ভ্যালি?

কুলু ভ্যালি। সুবিনয়কে মিসলিড করবেন। ও আপনাকে ফলো করার চেষ্টা করবে। যদি করে তো আপনি কলকাতা থেকে দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রীতির রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত সুবিনয়ের কলকাতায় থাকাটা নিরাপদ নয়। হি ইজ ডেঞ্জারাস।

আমি মাথা নাড়লাম। প্রাক্তন প্রেমিক এক বান্ডিল নোট বের করে আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, ফর দি এক্সপেনসেস, ফাইভ থাউজেন্ড।

অবাক হয়ে বলি, টাকা! টাকা কেন? আমি আমার স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য কাজ করব, আপনি টাকা দেবেন কেন?

কাগজের বউ। রুমা বলল।

না না। প্রেমিক বাধা দিয়ে বলে, আপনার বউ তো ঠিকই। কিন্তু টাকার তো দরকার হতে পারে। কিপ ইট অ্যাজ এ গিফট।

ইতস্তত করি। টাকা! কত টাকা! টাকা কি দুনিয়ায় সত্যিই সস্তা হয়ে গেল? আজকাল আমি পাশ ফিরলেও টাকা আসে। গোছ গোছা হ্যান্ডবিলের মতো টাকা।

প্রাক্তন প্রেমিক আমার পিঠে হাত রেখে দরজার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। আমি জেদির মতো দাঁড়াই।

প্রীতি মুখ তুলছে। চোখ মুছল। তারপর তাকাল আমার দিকে। দুই চোখ লাল। মুখখানা রুদ্ধ আবেগে ফেটে পড়ছে। ওর ঠোঁট নড়ল। কিছু বলল কি? কিছু শোনা গেল না। কিন্তু বুঝতে পারি, ও বলল, বেচারা!

প্রাক্তন প্রেমিকের হাত ছাড়িয়ে আমি প্রীতির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, প্রীতিসোনা, আমি তোমার জন্য সব করব। ভেবো না।

আমি প্রীতির দিকে এগিয়ে যাই। প্রীতি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি, প্রীতি, বউ আমার!

চকিত পায়ে রুমা রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। কঠিন গলায় বলে, উপলবাবু, প্রীতিকে একা থাকতে দিন।

অসম্ভব রাগে আমার শরীর স্টার্ট নেওয়া মোটরগাড়ির মতো গর্জন করতে থাকে। আমি বলি, সরে যান!

রুমা তার স্ক্যাশ করার প্রিয় ভঙ্গিতে হাতখানা ওপরে তোলে। বলে, নট এ স্টেপ ফারদার।

অভিজ্ঞতা বলে আমি কুঁকড়ে যাই। ডালমিয়া পার্কের সেই স্মৃতি দগদগ করে ওঠে পুরনো ব্যথার মতো। প্রাক্তন প্রেমিক এসে আমার হাত ধরে সান্ত্বনার গলায় বলে, আগে কাজ তারপর সব কিছু। প্রীতি আপনারই রইল। এখন ওকে বিপদ থেকে বাঁচানোটা আগে দরকার।

আমি মাথা নাড়ি। তারপর প্রাক্তন প্রেমিকের কানে কানে বলি, এর আগে আমার কখনও বিয়ে হয়নি, জানেন! আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে।

প্রাক্তন প্রেমিক আমাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। বলে, জানি। আপনি বড়

ভাল লোক। পৃথিবীর শেষ কয়েকটা ভাল লোকের মধ্যে আপনি একজন।

.

১৪.

সুবিনয় মুখ তুলে আমাকে দেখল। নিজের সিগারেটের ধোঁয়ায় ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সারা ঘরে বিদেহী আত্মার মতো অ্যালকোহলের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরটা আবছা, অস্পষ্ট।

আমি কাঁপা গলায় ডাকি, সুবিনয়।

ইয়াপ বাডি।— বলে সুবিনয় হেঁচকি তোলে।

আমার কিছু কথা আছে।

কলকল করে গেলাসে মদ ঢালবার শব্দ হয়। খস করে ওঠে দেশলাই। একটু আলো জ্বলে নিবে যায়।

সুবিনয় বলে, উপল, আমার কিছুতেই নেশা হচ্ছে না। সকাল থেকে একটানা খাচ্ছি। তবু কেন নেশা হচ্ছে না বল তো!

সুবিনয়, আমার কথাটা খুব জরুরি।

কী কথা?

আমি প্রীতিকে বিয়ে করেছি।

সুবিনয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাত্র। তার সিগারেটের আগুন তেজি হয়ে মিইয়ে যায়। গেলাস টেবিলে রাখার শব্দ হয়।

সুবিনয় বলে, কংগ্রাচুলেশনস।

ঠাট্টা নয় সুবিনয়, প্রীতি আমার বউ। মাই লিগাল ওয়াইফ। এই দ্যাখ সার্টিফিকেট।

সুবিনয় হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নেয়। দেখে। তারপর সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বলে, ড্যাম ফুল।

কে?

সুবিনয় আবছায়ার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকাল। গাঢ় স্বরে বলল, ইউ নো সামথিং বাডি? ইউ আর ফ্রেমড।

তার মানে?

সুবিনয় মাথা নেড়ে একটু হাসে। বলে, ইটস এ পেপার ম্যারেজ বাডি। এ পেপার ম্যারেজ। অ্যান্ড ইউ আর দ্য স্কেপগোট।

মাথাটা ঝিম করে ওঠে। তবু আমি যথাসাধ্য দৃঢ় গলায় বলি, না সুবিনয়, প্রীতি আমাকে ভালবাসে। ও সিঁদুর পরবে, শাঁখা পরবে। আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে।

জলপ্রপাতের মতো সুবিনয়ের হাসি ঝরে পড়তে থাকে। ম্যারেজ সার্টিফিকেটখানা তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, যা, এটাকে বাঁধিয়ে রাখিস।

আমি পাকানো কাগজটা খুলে সমান করতে করতে বলি, প্রীতি এখন আমার বউ সুবিনয়, তুই ডিস্টার্ব করবি না।

সোফায় চিতপাত হয়ে শুয়ে সুবিনয় বলে, করব না উপল। বোস।

আমি বসি।

সুবিনয় উদাস গলায় বলে, প্রীতি পরশুদিন যাচ্ছে তা হলে?

না না। আমরা কাল হানিমুনে যাচ্ছি। কুলু ভ্যালিতে। মুখস্থ বলে যাই।

ও হাসে, বলে, আই ক্যান স্মেল দ্য ট্রুথ বাডি। ডোন্ট টেল লাইজ।

আমি ভয় পাই। আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ঘামতে থাকি।

সুবিনয় উঠে বসে। বলে, উপল, এ সব ছেলেমানুষি চালাকি ও করছে কেন? কোনও লাভ নেই। আমি ইচ্ছে করলেই ওর যাওয়া আটকে দিতে পারি। ওর প্রেমিককে ছমাসের জন্য হাসপাতালে পাঠাতে পারি।

আমার শরীরে একটা মোটরগাড়ি হঠাৎ স্টার্ট নেয়। গরগর করে গর্জন করতে থাকে রাগ।

চাপা গলায় বলি, সুবিনয়! সাবধান।

সুবিনয় বলে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আমার সব স্বাভাবিক বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। আমি এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাই। বলি, প্রীতি সম্পর্কে আমি কোনও কথা শুনতে চাই না আর। শি ইজ মাই ওয়াইফ।

সুবিনয় একটা হেঁচকি তুলে হেসে ওঠে।

আমি বিনা দ্বিধায় ওর মুখের দিকে লাথি চালিয়ে বলি, স্কাউড্রেল।

লাথি লাগল জুতোসুদ্ধ। সুবিনয় একটা ওঁক শব্দ করে দু'হাতে থুতনি চেপে ধরল। দ্বিতীয় লাথিটা লাগল ওর মাথায়। টলে সোফায় পড়ে গেল সুবিনয়। আমি বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে দু' হাতের থাবায় ওর গলার নলি আঁকড়ে ধরে বলি, মেরে ফেলব কুকুর। মেরে ফেলব।

আমার দাঁতে দাঁতে এত জোর ঘষা লাগে যে, গম পেষাইয়ের শব্দ হতে থাকে।

সুবিনয় চোখ চেয়ে খুব অবাক হয়ে আমাকে দেখল।

আমি আমার সর্বস্ব শক্তি দিয়ে ওর গলায় আঙুল বসিয়ে দিচ্ছি। মস্ত মোটা গর্দান, প্রচণ্ড মাংসপেশি। তবু আমার তো কিছু করতে হবে। প্রাণপণে ওর গলা টিপে বলি, মরে যা! মরে যা! মরে যা।

সুবিনয় বাধা দিল না। শুধু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

আমি কার্পেটের ওপর হড়াস করে পড়ে গেলাম।

আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সুবিনয় তার মদের গেলাস তুলে নিয়ে বলল, তুই কত বোকা উপল। তুই বুঝিসনি, ওরা তোকে আমার হাতে ঠ্যাঙানি খাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে।

আস্তে আস্তে আমি উঠে বসি। মাথাটা ঘুরছে। আমি অনেকক্ষণ কিছু খাইনি।

সুবিনয় আমাকে দেখল। মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু প্রীতির জন্য তোকে আমি মারব না উপল। প্রীতি ইজ নট মাই প্রবলেম। আমি জানতে চাই, তুই ক্ষণাকে কী করেছিস।

আমি কষ্টে মুখোমুখি সোফায় উঠে বসি। শরীরে রাগ ছেড়ে যাওয়ার পর গভীর অবসাদ। মাথাটা চেপে ধরে বললাম, আমি কিছু করিনি সুবিনয়। তুই যা করতে বলেছিস।

সুবিনয় গেলাসে মদ ঢালে। ফের সিগারেট ধরায়।

উপল।

উ।

ক্ষণা নষ্ট হয়ে গেছে। থরোলি স্পয়েল্ট।

বলে সুবিনয় আমার দিকে অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল। দৃষ্টিতে ভয়, ঘৃণা, বিস্ময়। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে আর-একটু তীব্র স্বরে বলল, ডেমন! শয়তান! ক্ষণাকে তুই কী

করেছিস?

আমার সমস্ত শরীর সেই স্বরে কেঁপে ওঠে। মুখে জবাব আসে না।

সুবিনয় তার বিশাল চেহারা নিয়ে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ওকে বড় ভয়ংকর দেখাতে থাকে। আমি কুঁকড়ে বসে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকি।

ক্ষণা সম্পূর্ণভাবে আমার ছিল। আমি যা চাইতাম ও তাই করত। যেমনভাবে চলতে বলতাম তেমনি চলত। কখনও এতটুকু অবাধ্য ছিল না। আমার দিকে যখন তাকাত তখন ওর চোখে একটা আলো দেখা দিত। বড় সুন্দর আলো। পৃথিবীতে আমি ছাড়া কোনও পুরুষকে ও কোনও দিন ভাল করে লক্ষও করেনি। কিন্তু কাল রাতে ও আমাকে দেখে ভয়ে আতঙ্কে নীলবর্ণ হয়ে গেল। কাছে এল না। চোখে চোখ রাখল না। বার বার আমার চোখ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল। কী করেছিস উপল?

আমি মার ঠেকানোর জন্য দুটো হাত তুলে বলি, সুবিনয়, দ্যাখ।

সুবিনয় এক পা এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বলে, কী দেখব?

আমি হাঁ করে আমার মুখের ভিতরটা দেখতে ওকে ইঙ্গিত করি। ও দেখে, তারপর বলে, কী?

দেখলি না?

না। কী দেখাচ্ছিস হাঁ করে?

শ্বাস ফেলে বলি, বিশ্বরূপ। অর্জুন দেখেছিল। তুইও দেখলে দেখতে পেতিস, যা হওয়ার তা হয়ে আছে। আমি নিমিত্তমাত্র।

সুবিনয় দুই হাতের চাপে মদের গেলাসটা ভেঙে ফেলল। তীব্র বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আমাকে বলল, তুই ক্ষণাকে কীরকম বিশ্বরূপ দেখিয়েছিস উপল? ওকে কী করে নষ্ট করলি?

আমি কী করব সুবিনয়? আমাকে দিয়ে করিয়েছিস তুই।

সুবিনয় মাথা নাড়ল, ক্ষণা কী করে নষ্ট হতে পারে? কী করে আমাকে ছেড়ে ও তোকে ভালবাসে উপল? ইজ ইট পসিবল?

কাছে এগিয়ে এসে সুবিনয় আমার বুকের জামাটা ধরে টেনে তোলে আমাকে। তারপর হেঁচড়ে নিয়ে যায় আলোর কাছে। ভাল করে দেখে আমাকে। মৃদু সাপের মতো হিসহিসে স্বরে বলে, কী আছে তোর মধ্যে? কী দেখেছিল ক্ষণা? টেল মি বাস্টার্ড, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান টু হার?

আমার জামার কলার এঁটে বসে গেছে। দম নেওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করি। সুবিনয় আমার চোখের ভিতর দিয়ে আমার ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করে। বলে, কী করেছিস তুই আমার ক্ষণাকে? কেন ক্ষণা আর আমাকে ভালবাসে না? বল। বল।

আমাকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেয় সুবিনয়। আমি দাঁড়াই। ঠিক তৎক্ষণাৎ সুবিনয়ের ঘুসি এসে লাগে আমার মুখে।

সমস্ত চেতনায় ঝিঁঝি ডেকে ওঠে। অতল অন্ধকারে পড়ে যেতে থাকি। শুনতে পাই এক ঘ্যাঙানে ভিখিরির স্বরে সুবিনয় বলছে, ফিরিয়ে দে। ফিরিয়ে দে ক্ষণাকে।

.

সারা শরীর ব্যথা-বেদনার ডুবজলে ডুবে আছে। মাথাটা ফাঁকা, ভার। কঁকিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করি। হাত বাড়িয়ে একটা রেলিং-এর থাম হাতে পাই। ধরি। চোখে ভাল ঠাহর হয় না। ঝাপসা বুঝতে পারি, দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে অনেক ওপরে। ওখান থেকে গড়িয়ে পড়েছি এত দূরে।

সিঁড়িটা আমার দিকে চেয়ে আছে। করুণ চোখে বলে দিচ্ছে, যা দিয়ে নামা যায় তা-ই দিয়েই ওঠা যায়। কিন্তু তুমি আর সিঁড়ি বেয়ে উঠো না উপলভায়া। এই আশ্রয়টাও তুমি হারালে।

সিঁড়ির দিকে চেয়ে আমি মাথা নাড়ি। বুঝেছি।

কাঁকালটা চেপে ধরে অষ্টাবক্রের মতো বেরিয়ে আসি রাস্তায়। ফাঁকা আকাশ, খোলা হাওয়া। এখন এ ছাড়া আমার আর কী রইল? বড় ভাল লাগল দুনিয়াটাকে।

কিন্তু বিবেকশালা কি ছাড়ে? পিছু থেকে এসে কানে কানে বলে দেয়, আছে হে। এখনও অনেক আছে।

পকেটে হাত দিই। ট্যাঁকে হাত দিই। হাজার হাজার টাকা খচমচ করে ওঠে।

বিবেক বলে, একটা ট্যাক্সি করো হে উপলচন্দোর। ওড়াও।

জিভটা কেটে দু'আধখানা হয়ে গেছে প্রায়। জমাট রক্ত থুঃ করে ফেলি। কপালের দু'ধারে দুটো আলু উঠেছে। চোখ ফুলে ঢোল। পাঁজরায় খিচ ধরে আছে। ঘাড় শক্ত। হাতের পায়ের জোড়ে সাড় নেই।

কাটা জিভটা নেড়ে বড় কষ্টে বলি, সবাই বড় মারে বিবেকবাবা।

সামনে একটা ট্যাক্সি থামে। উঠে পড়ি। ট্যাক্সিওলা সন্দেহের চোখে এক বার, দু' বার তাকায় আমার দিকে। ভয়ে সিঁটিয়ে বসে থাকি। যদি এই মার খাওয়া চেহারা দেখে নিতে না চায়।

পরমুহূর্তেই মনে পড়ে, আমার পকেটে অফুরন্ত টাকা আছে। অনেক টাকা। ব্যক্তিত্ব এসে যায়। আত্মবিশ্বাস আসতে থাকে। গম্ভীর মুখ করে বলি, মধু গুপ্ত লেন চলুন।

মধু গুপ্ত লেন-এর সমীর আর তার সাঙাতরা দিনরাত আমার পথ চেয়ে আছে। ওরা আশায় আশায় পথে পায়চারি করছিল। ট্যাক্সি থামতেই ছুটে এল রুস্তমরা।

আমি টাকা মুঠো করে জানালার বাইরে হাত বাড়াই। কাটা জিভে বড় কষ্টে বলি, কেতকীকে ছেড়ে দেবেন।

এক রুস্তম জানালায় ঝুঁকে পড়ে বলে, আপনি কেতকীকে নেবেন? বলুন, তুলে এনে গাড়িতে ভরে দিই।

আমি মাথা নাড়ি, না। আমার বউ আছে। আমি বউয়ের কাছে যাব।

আগের দিনের সেই ছেলেটা গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বলে, কোন বাঞ্চোত আপনার গায়ে হাত তুলেছে বলুন তো? শুধু ঠিকানা বলে দিন, খবর হয়ে যাবে।

আমি মাথা নাড়ি, না। আমি সবাইকে ক্ষমা করেছি। আমি আমার বউয়ের কাছে যাব এখন। আমার ব্যথার জায়গাগুলোয় সে হাত বুলিয়ে দেবে। আমি ঘুমিয়ে পড়ব। অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে ঘুমোব।

ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আমি বড় রাস্তায় চলে আসি। চার দিকে রাত আটটার কলকাতা ডগমগ করছে। বড় ভাল লাগে। যেন এক অনন্ত উৎসব চলেছে। সুখী মানুষরা জড়ো হয়েছে দোকানে দোকানে, সিনেমায়, রাস্তায়।

কাটা জিভ নেড়ে বলি, মানুষকে আরও সুখী করতে চাই আমি বিবেকবাবা। আজ রাতে আমি আমার বউয়ের কাছে যাব তো! আজ সবাই সুখী হোক। আশীর্বাদ করুক।

আমার বিবেক তার বাদ্যযন্ত্রে একটা পিড়িং শব্দ তুলে বলে, এখনও অনেক টাকা রয়ে গেল তোমার উপলচন্দোর। তুমি যে হ্যান্ডবিলের মতো টাকা ওড়াতে চেয়েছিলে।

ঠিক। ঠিক। আমি মাথা নাড়ি।

এক মুঠো টাকা বান্ডিল থেকে খুলে এনে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিই বাইরে। ঠিক অবিকল হ্যান্ডবিলের মতো বাতাসের ঝটকায় টাকা উড়ে যায়। ঘুড়ির মতো লাট খায় শূন্যে। তারপর আলোকিত রাস্তা-ঘাট আর মানুষজনের ওপর নেমে আসে।

পিছনের কাচ দিয়ে আমি ঘুরে দেখি। মানুষজন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দৌড়োচ্ছ টাকার দিকে। চলন্ত ট্রামবাস থেকে নেমে পড়ছে রাশি রাশি মানুষ। একটা লোক চলন্ত গাড়ির নীচে চলে গেল টাকা কুড়াতে গিয়ে।

আর-এক মুঠো উড়িয়ে দিই। দেখি। দোকান ছেড়ে নেমে আসছে দোকানি। হাড়কাটা

গলির ভাড়াটে মেয়েরা খদ্দের ভুলে পিল পিল করে রঙিন মুখ আর তেল-সিঁদুরের ছোপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একটা ঠ্যাং-ভাঙা লোক টানা রিকশায় বসে মেডিকেল কলেজে যাচ্ছিল, সে হঠাৎ দু পায়ে লাফ মারল রাস্তায়।

বউবাজারের মোড় পেরিয়ে আর-এক মুঠো ওড়াই।

ট্যাক্সিওলা ট্যাক্সি থামিয়ে বলে, কী হচ্ছে বলুন তো পিছনে?

কিছু না। আপনি চলুন।

ট্যাক্সিওলা আবার গাড়ি ছাড়ে। আমি টাকা ওড়াতে থাকি। আমার পিছু পিছু কলকাতা পাগল হতে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ ডিউটি ভুলে লাফিয়ে পড়ে রাস্তায়। সিনেমা ভেঙে যায়। দোকানেবাজারে ঝাঁপ পড়তে থাকে। দাঙ্গা লেগে যায়। ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হতে থাকে। একটা কালো পুলিশের গাড়ি ধেয়ে আসতে থাকে আমার দিকে। আমি পাত্তা দিই না। চৌরঙ্গির মোড়ে আমি মহানন্দে টাকা ছড়াই।

টাকা ওড়ে। লাট খায়। পড়ে।

আমি মুগ্ধ চোখে দেখি। ঠিক এইরকম ভাবে আমি টাকাকে দেখতে চেয়েছি বরাবর। সস্তা, সহজ, প্রচুর। দেখতে দেখতে এত মোহিত হয়ে যাই যে, আমার কিছু খেয়াল থাকে না। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে কখন। পুলিশের গাড়ি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

সিপাইজিরা যখন ধরাধরি করে গাড়িতে তুলছিল তখন কেবল আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলছিলাম, ছেড়ে দাও আমাকে। আমার বউ বসে আছে আমার জন্য। আমি তার কাছে যাব।

পিস্তলওলা এক পুলিশ সাহেব বলল, এত কালো টাকা আমি কখনও দেখিনি।

.

আমার ক'মাসের মেয়াদ হয়েছিল আমি জানি না। যখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রায় পড়ছিলেন তখন আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

কম্বলে শুয়ে আমার গায়ে বড় চুলকুনি হয়েছে, তাই খুব চুলকোচ্ছিলামও। রায় পড়া হয়ে গেলে পুলিশ আমাকে জেলে আটকে রাখল।

তারপর ছেড়েও দিল একদিন।

কোনও মানে হয় না। খামোকা এই আটকে রাখা আর ছেড়ে দেওয়া।

বেরিয়ে এসে পৃথিবীর রাস্তাঘাট কিছু অচেনা ঠেকছিল, আর-একটা লোকও ছাড়া পেয়ে সঙ্গে নিয়েছিল। পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, শালারা বোকা।

কারা?

ওই যারা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল। বুঝলে! আসলে খুনটা আমিই করেছিলাম। বদ্যিনাথ নয়। তা বদ্যিনাথের যাবজ্জীবন হল, আমার ছ’ মাস।

বলে খুব হাসল লোটা। বলল, কালীমায়ের থানে একটা পুজো দিই গে। তারপর গঙ্গাস্নান করে সোজা বাড়ি। তুমি কোন দিকে?

বেঁটে, কালো, মজবুত চেহারার লোকটার দিকে চেয়ে থাকি। তারপর বলি, আমার রাস্তাঘাট সব গুলিয়ে গেছে। ঠিক চিনতে পারছি না। আমি আমার বউয়ের কাছে যাব।

তা আর ভাবনা কী। চলো একসঙ্গে যাই। একদিন না একদিন ঠিক বউ এসে জুটবে তোমার।

আমি মাথা নেড়ে তার সঙ্গ ধরলাম।

লোকটা পুজো দিল, গঙ্গাস্নান করল। তারপর আমাকে নিয়ে কালীঘাট স্টেশন থেকে ট্রেন ধরল। ফের শিয়ালদায় এসে ট্রেন পালটে আর-এক ট্রেন। লোকটা যায়। আমিও যাই। বরাবরই দেখেছি একবার বেরিয়ে পড়লে কেউ-কেউ জুটে যাবেই।

পলাশি স্টেশনে নেমে অনেকখানি মাঠঘাট, খানাখন্দ পেরিয়ে হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে বলি, ওহে বাপু, বড় যে নিয়ে যাচ্ছ, খুব খাটাবে নাকি?

লোকটা ভালমানুষি ঝেড়ে ফেলে বলে, তার মানে? কালীঘাটে খাওয়ালুম, এতগুলো গাড়িভাড়া গুনলুম, সে কি এমনি এমনি নাকি? মুখ দেখব বলে তো নয়। একটু ছিটেল লোক আছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু বসে খাওয়া আমি দু’চক্ষে দেখতে পারি না। গতরখাস হয়ে বসে থাকলে ঠ্যাঙানি খাবে।

এরকমই সব হওয়ার কথা। একটা শ্বাস ফেলি। ভাবি, একদিন রাস্তাঘাট যখন সব ভেসে উঠবে চোখের সামনে, সেদিন দুনিয়ার সুন্দর একটা সহজ রাস্তা ধরে আমি যাব আমার বউয়ের কাছে। তত দিন একটু অপেক্ষা। মাথাটা পরিষ্কার হোক।

লোকটার কাজ বড় কম ছিল না। দু’বিঘে একটা চাষের জমি কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে ভেজাতে হয়। বড় কষ্ট। আগাছা সাফ করি। উঠোন ঝাটাই। গোরুর জাবনা দিই। সারা দিন আর সময় হয়ে ওঠে না–

রাত্রিবেলা সব দিন ঘুম আসে না। বিছানা ছেড়ে উঠে চলে আসি খোলা হাওয়ায়, মাঠের মধ্যে। চার দিকে মস্ত আকাশ, পায়ের নীচে মস্ত মাটি। এই আকাশ গোটা দুনিয়াকে ঘিরে রেখেছে। এই মাটি চলে গেছে বরাবর সব মানুষের পায়ের নীচ দিয়ে। যোগ রেখেছে সকলের সঙ্গে সকলের। ভাবতে বড় ভাল লাগে।

এক-একদিন বুড়ো বিবেক এসে পাশে বসে। বলে, উপলচন্দোর, তোমাকে একটু

দুঃখের গান শোনাতে ইচ্ছে করছে।

শোনাও।

কিন্তু গান গাইতে গেলেই বিবেকের বড় কাশি উঠে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর শোনাতে পারে না। হাঁপিয়ে উঠে বলে, কী কাণ্ড! ওঃ, কেতকীর বিয়েতে খুব খাইয়েছিল হে উপলচন্দোর। খুব। কুমড়োর একটা ছক্কা যা করেছিল!

কেতকী কি কেঁদেছিল বিবেকবাবা?

তা কাঁদবে না? মেয়েরা শ্বশুরঘরে যাওয়ার সময়ে কত কাঁদে।

কিন্তু আমার জন্যও তার কাঁদবার কথা ছিল যে!

বিবেক বলে, তা সে এক কান্নার মধ্যেই মানুষের কত কান্না মিলেমিশে থাকে। আলাদা করে কি বোঝা যায় কার জন্য কোন হিক্কাটা তুলল। তবে তোমার মাসিকে একবার বলেছিল বটে, পিসি, উপলদা এল না। তার জন্যই আমার এত ভাল বিয়ে হচ্ছে। সে কথা থাক উপলচন্দোর। তোমাকে বরং কুমড়োর ছক্কাটার কথা বলি, কী ভুরভুরে ঘিয়ের বাস, গরম মশলার সে যে কী প্রাণকাড়া গন্ধ, কাবলি ছোলা দিয়েছিল তার মধ্যে আবার।

সুবিনয় কি ক্ষণার সঙ্গে ঘর করে বিবেকবাবা?

বিবেক ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, খুব করে, খুব করে। সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তারা এখন খুব সিনেমা-থিয়েটারে যায়। আর সময় পেলেই তোমার খুব নিন্দে করে বসে বসে।

বিবেকবাবা, প্রীতির কথা কিছু জানো?

সে আর জানা শক্ত কী! আমেরিকায় গিয়ে তোমার নামে ডিভোর্সের মামলা দায়ের করল। তুমি তখন জেলে। একতরফা ডিক্রি পেয়ে তার সেই ভাবের লোকের সঙ্গে বিয়ে বসেছে। পাঁচ হাজার টাকা কি তোমাকে এমনি এমনি দিয়েছিল বাপু? তবে মাঝে মাঝে বলে বটে, উপলটা বড্ড বেচারা!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি।

বিবেক আমার দিকে চায়। বলে, আরও খবর চাও নাকি? সেই যে পৈলেন ট্রেন থেকে পড়ে গেল। মনে আছে? সে কিন্তু মরেনি। এক ঠ্যাং কাটা গেছে, সে এখন ন্যাকড়ার পুতুল তৈরি করে বেচে। হাজু আর কদম এখনও ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়াচ্ছে। সেই মানিক সাহা সুন্দরবনে একা থাকে, এক নৌকোয় চাকরি পেয়েছে। বড় আনন্দে আছে। আরও শুনবে?

মাথা নেড়ে বলি, না বিবেকবাবা।

বিবেক বলে, আমিও তাই বলি। শুনে কাজ কী উপলচন্দোর? ও সব তো তোমার সমস্যা নয়। তোমার সমস্যা তুমি নিজেই। তাই বরং তোমাকে কুমড়োর ছক্কার গল্পটা বলি, আচ্ছা, না হয় কেতকীর বিয়েতে যে রসকদম্ব খাইয়েছিল সেটার কথা শোনো। সে রসকদম্বের কোনও জুড়ি নেই–

আমি ঘুমিয়ে পড়ি শুনতে শুনতে। বিবেক বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

আর তখন সেই অন্ধকার, একা মাঠের মধ্যে হঠাৎ চিড়িক করে ডেকে ওঠে মেঠো ছুঁচো, ইঁদুর, কীটপতঙ্গেরা, চার দিকে তাদের ডাক বেজে ওঠে। পরস্পরকে ডেকে জাগিয়ে তোলে তারা।

আমিও জাগি। বসে থাকি চুপ করে। আস্তে আস্তে আমার পেটের মধ্যে জেগে ওঠে ভূতের মতো খিদে। ক্যানসারের মতো, কুষ্ঠের মতো দুরারোগ্য খিদে। জেগে টের পাই, পৃথিবী জুড়ে খিদে জাগে, ঘুম ভেঙে যায় ইঁদুরের, মানুষের, কীট ও পতঙ্গের।

শেষরাতে চাঁদ উঠে আসে আকাশে। চেয়ে থাকি। ইঁদুরেরাও চায়। বলি, বড় খিদে পায়।

বিদ্যুৎবেগে আমার সেই কথা চলে যায় দিকবিদিকে। সারা দেশ ও বিদেশ জুড়ে পশু পাখি ও মানুষের অনেক স্বর বলে ওঠে, আমাদের হৃদয়ের কোনও সমস্যা নেই। দর্শন, বিজ্ঞান, প্রেমভালবাসা নেই। শুধু খিদে পায়। বড় খিদে পায়।

শেষ পৃষ্ঠা

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

সমস্ত বই গুলি টেলিগ্রামে পাবেন। অন্যান্য বিভিন্ন নতুন বই পেতে আমাদের গ্রুপে Volunteer হিসেবে যোগদান করুন। এগিয়ে আসুন যাতে আরও বই তৈরীতে সাহায্য করা যায়।

আরও বই ⏬